HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন

টপিক – ০১ ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষাপট
টপিক ০২: পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যঃ সিভিল সার্ভিস সামরিক ক্ষেত্র
টপিক ০৩: রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য
টপিক ০৪: ছয় দফা
টপিক ০৫: ছয় দফার গুরুত্ব
টপিক ০৬: ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা
টপিক ০৭: ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার বিচার প্রক্রিয়া
টপিক ০৮: ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান
টপিক ০৯: গণঅভ্যুত্থান ও মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
টপিক ১০: আসাদুজ্জামান ও অন্যান্য
টপিক ১১: ১৯৭০-এর নির্বাচন

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১২: ১৯৭০-এর নির্বাচনের প্রভাব ও গুরুত্ব

টপিক ১৩: অসহযোগ আন্দোলন এবং এর প্রভাব

টপিক ১৪: ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ

টপিক ১৫: ৭ মার্চের ভাষণের প্রভাব ও গুরুত্ব

টপিক ১৬: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

টপিক ১৭: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

This Topic is important for

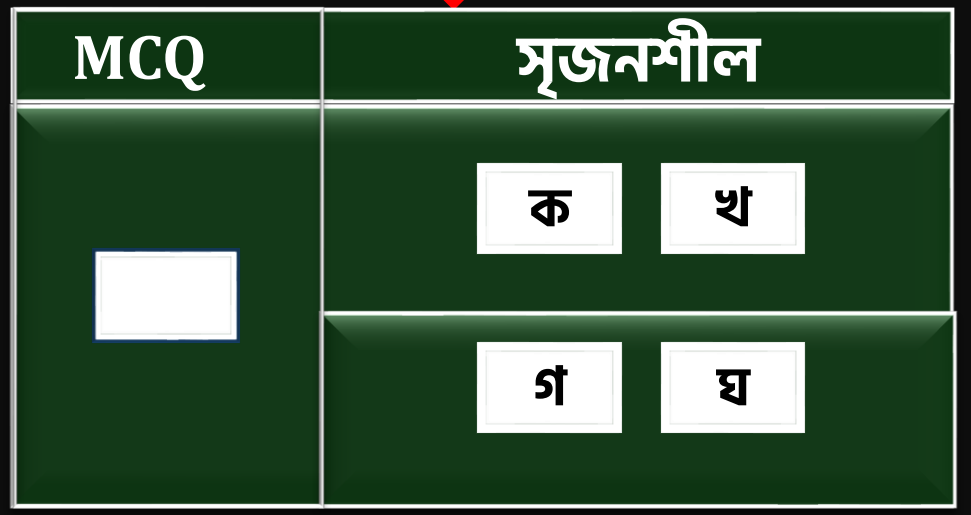

১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে এ যুদ্ধ শুরু হলেও বাঙালিরা চরম নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হয়। কেননা পাকিস্তানি শাসকবর্গ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নিরাপত্তার জন্য কোনো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর ভারতবর্ষের কতিপয় অঞ্চল এবং দেশীয় রাজ্য নিয়ে সমস্যার সমাধান হয়নি। ব্রিটিশ সরকার এসব অঞ্চলে বিশেষ করে কাশ্মীর অঞ্চলে তার কর্তৃত্বকে ধরে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু ভারত বিভক্তির পরপরই কাশ্মীরের কর্তৃত্বকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান ও ভারত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। কাশ্মীর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হওয়ায় পাকিস্তান সমগ্র কাশ্মীরের ওপর তার অধিকার দাবি করে। কিন্তু কাশ্মীরের রাজা ছিলেন হিন্দু। ভারত দাবি করে যে, কাশ্মীরের রাজা হরি সিং ভারত ইউনিয়নে যোগদানের জন্য চুক্তি করায় কাশ্মীরের ওপর তার দাবি আইনসিদ্ধ।

১৯৬৫ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে নির্বাচনে জোর করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেও আইয়ুব খান সম্মিলিত বিরোধী দলের (COP- Combined Opposition Party) গণআন্দোলনের হুমকির মুখোমুখি হন। মোট ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর ভোটের ৬৪ শতাংশ পান আইয়ুব খান এবং ফাতিমা জিন্নাহ পান ৩৬ শতাংশ ভোট। পূর্ব বাংলায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী ফাতিমা জিন্নাহ তার দ্বিগুণ ভোট লাভ করেছিলেন। এজন্য আইয়ুব খান পূর্ব বাংলার মানুষের দৃষ্টি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য ভারতবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ক্রমে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং উভয় রাষ্ট্র দ্বিতীয় বারের মতো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধে চীন ভারতশাসিত কাশ্মীরের 'আকসাই' অঞ্চল দখল করে নিলে এবং চীন-পাকিস্তান মৈত্রী গড়ে উঠলে আইয়ুব খান উৎসাহিত হন। ইতোমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে আইয়ুব খানের সুসম্পর্ক তৈরি হয়। এদিকে ভারত সরকার কাশ্মীর সম্পর্কে পূর্বের নীতি পরিবর্তন করে সংবিধান সংশোধন করে কাশ্মীরকে সম্পূর্ণরূপে ভারতের অঙ্গীভূত করে নেন। ফলে কাশ্মীরের নেতা শেখ আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ভারত সরকার আব্দুল্লাহকে গ্রেফতার করলে কাশ্মীরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৬৫ সালের জুলাই থেকে ভুট্টোর পরিকল্পনা মোতাবেক কাশ্মীরে পাকিস্তানি গেরিলা অনুপ্রবেশ শুরু হয়। ৯ আগস্ট অনুপ্রবেশকারীরা জম্মু ও কাশ্মীর বিপ্লবী পরিষদ গঠন করে পাকিস্তানি সেনা সহায়তায় ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে ব্যাপক নাশকতা শুরু করে। সরকারি বাহিনীর সাথে কাশ্মীরিদের ব্যাপক সংঘর্ষ চলতে থাকে। পাকিস্তানি প্রচারযন্ত্র একে কাশ্মীরি জনতার বিদ্রোহ বলে ব্যাপক প্রোপাগান্ডা চালায়। ৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর অঞ্চলে সেনা অভিযান শুরু করলে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়।

১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

যুদ্ধের শুরু থেকেই ভারতীয় বাহিনী প্রাধান্য বিস্তার করে। এক পর্যায়ে তারা আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে লাহোরের দিকে অগ্রসর হলে পাকিস্তান চরম হুমকির মুখোমুখি হয়। এই চরম দুর্দিনে পূর্ব পাকিস্তানি সৈন্যরা পরম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে ভারতীয় বাহিনীর অগ্রযাত্রা রুখে দেয়। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের শোচনীয় অবস্থার কথা চিন্তা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন উদ্যোগ নিয়ে উভয় রাষ্ট্রকে যুদ্ধবিরতিতে বাধ্য করে। ১৭ দিন যুদ্ধের পর ২৩ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বন্ধ হয়। ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সেই কোসিগিনের মধ্যস্থতায় উভয় দেশ তাসখন্দে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। এর মাধ্যমে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। তবে মজার ব্যাপার হলো- তাসখন্দ চুক্তির ৯টি ধারার কোনোটিতেই কাশ্মীরসংক্রান্ত কোনো ধারা ছিল না।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন

টপিক – ০২ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যঃ
সিভিল সার্ভিস সামরিক ক্ষেত্র

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যঃ সিভিল সার্ভিস সামরিক ক্ষেত্র

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যঃ সিভিল সার্ভিস সামরিক ক্ষেত্র

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। এর কারণ যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ পূর্ব পাকিস্তানকে প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখেছিল। ১৭ দিনব্যাপী যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানসহ পুরো বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ভারত ইচ্ছা করলে অনায়াসেই এসময় পূর্ব পাকিস্তানকে দখল করে নিতে পারত। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বেড়ে যায়। চরম খাদ্যসংকট দেখা দেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান পশ্চিম পাকিস্তানিদের তুলনায় কত নিম্নগামী তা হাড়ে হাড়ে টের পায়। সকল ক্ষেত্রে তারা যে ব্যাপক শোষণ আর বঞ্চনার শিকার হয়েছে তা তারা সম্যকভাবে উপলব্ধি করে। নিচে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের বৈষম্য চিত্র উপস্থাপিত হলো:

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যঃ সিভিল সার্ভিস সামরিক ক্ষেত্র

সিভিল সার্ভিসে বৈষম্য

উত্তরাধিকারসূত্রে পাকিস্তান যে কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস প্রাপ্ত হয় তাতে অবাঙালি কর্মকর্তারাই উচ্চতর পদগুলো দখল করেন। ১৯৪৭ সালে যে ১৫ জন প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের সদস্যকে কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসে পদোন্নতি দেয়া হয়েছিল তার মধ্যে মাত্র ৪ জন ছিলেন বাঙালি। রাজধানী করাচিতে হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের পদগুলোতে স্বভাবতই অবাঙালিরা চাকরিপ্রাপ্ত হয়। তাছাড়া ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি না পাওয়ায় বাঙালি ছাত্রদের পক্ষে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি চাকরিতে যোগদান করা সহজ ছিল না। ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের ৪২,০০০ কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে বাঙালিদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৯০০ জন এবং এর অধিকাংশই ছিল নিম্ন পদের। ১৯৪৭সালে যে ৯৪ জন বাঙালি নন এমন ICS অফিসার পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেছিলেন, তার মধ্যে ১৯৬৫ সালে ৪৭ জন কর্মরত ছিলেন। তারা ছিলেন তখন বয়োজ্যেষ্ঠ অফিসার এবং তারা রাষ্ট্রের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। ফলে বাঙালিদের পক্ষে প্রশাসনে কেউ ছিল না বললেই চলে। পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির পর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পায়। সামরিক শাসনের প্রথম ৪৪ মাসে যে ৭৯০ জন জুনিয়র গ্রেডের কর্মচারী নিয়োগ করা হয় তার মধ্যে মাত্র ১২০ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের।'

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যঃ সিভিল সার্ভিস সামরিক ক্ষেত্র

সিভিল সার্ভিসে বৈষম্য

১৯৫৯-৬৩ পর্যন্ত রাওয়ালপিন্ডির সচিবালয়ে ৩১৫ জন কেরানি নিয়োগ দেয়া হয় যার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানি ছিল মাত্র ৩৬ জন। ১৯৬০-৬৩ পর্যন্ত ১৪ জন সামরিক কর্মকর্তাকে বেসামরিক প্রশাসনে নিয়োগ দেয়া হয়। তাদের মধ্যে কোনো বাঙালি কর্মকর্তা ছিল না।'

১৯৬৬ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানি গেজেটেড কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১,৩৩৮ জন এবং ৩,৭০৮ জন। নন-গেজেটেড কর্মচারীর সংখ্যা ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের যথাক্রমে ২৬,৩১০ জন এবং ৮২,৯৪৪ জন।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যঃ সিভিল সার্ভিস সামরিক ক্ষেত্র

সমরিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

সামরিক বাহিনীতে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত বাঙালি নিয়োগ লাভ করে ৮১০ জন। রিক্রুটিং কমিটিগুলো তৈরি করা হয়েছিল, অবাঙালিদের দ্বারা। দেহের মাপ এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল যে খুব কম বাঙালিরই দৈহিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ ছিল। তাছাড়া সামরিক বাহিনীতে যোগ দিলেই পোস্টিং দেয়া হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে সুদূর বিদেশি পরিবেশে ১৬-২০ বছর চাকরি করতে হবে বিধায় খুব কম অভিভাবকই তার সন্তানকে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে উৎসাহ দিতেন। এভাবে দেখা যায়, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বিভাগে বাঙালিদের যোগদান করা রীতিমতো অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সারণিতে সামরিক বাহিনীতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অংশগ্রহণের একটি চিত্র পাওয়া যাবে।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যঃ সিভিল সার্ভিস সামরিক ক্ষেত্র

পদবি	পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসার সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তানি অফিসার সংখ্যা
লে. জেনারেল	৩	০
মেজর জেনারেল	২০	০
ব্রিগেডিয়ার	৩৪	১
কর্নেল	৪৯	১
লে. কর্নেল	১৯৮	২
মেজর	৫৯০	১০
সেনাবাহিনীতে মোট	৮৯৪	১৪

নেভি ও বিমান বাহিনীতে বৈষম্য:		
পদবি	পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসার সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তানি অফিসার সংখ্যা
নেভিতে মোট	৫৯৩	৭
বিমানবাহিনীতে মোট	৬৪০	৬০

সেই সময় সামরিক ক্ষেত্রে বরাদ্দের বেলায়ও পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান ব্যাপক বৈষম্যের শিকার হয়। সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর সদরদফতর পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপন করায় রাজস্ব বাজেটের ৬০% যা এ খাতের জন্য বরাদ্দ ছিল তার পুরোটাই পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করা হয়েছিল। ১৯৪৭-৫৬ সময়কালে প্রতিরক্ষা সদর দফতরগুলোর প্রশাসনিক খরচ ছিল ২,৫৬৩.৯ মিলিয়ন টাকা যার পুরোটাই পশ্চিম অংশে ব্যয় করা হয়েছিল। এ সময়কালে প্রতিরক্ষা খাতে মোট ব্যয় ছিল ৪৫৬৫.৭ মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে মাত্র ১৬৭.২ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যঃ সিভিল সার্ভিস সামরিক ক্ষেত্র

এবার দেখা যাক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এবং স্টেট ব্যাংকের চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্যের চিত্রটি:

চাকরির ক্ষেত্র	সাল	মোট সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
ফরেন সার্ভিস ক্যাডার	১৯৫৩	১১৯	৩৬	৮৩
	১৯৬২	২৪০	৫০	১৯০
স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান	১৯৫০	২০৬	৪১	১৬৫
	১৯৬৩	৭৫১	২৩৬	৫১৫

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন

টপিক – ০৩ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

বাঙালিরা শুধু প্রশাসন, শিক্ষা ও সামরিক ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার হয়নি, রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ২৩ বছরে মাত্র একবারের জন্য পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানের পদ বাঙালিদের দেয়া হয়েছিল। খাজা নাজিমউদ্দীন ১৯৪৮-৫১ সময়ে গভর্নর জেনারেলের পদ লাভ করেছিলেন, কিন্তু এসময় অবাঙালি প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান প্রকৃতপক্ষে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। আবার লিয়াকত আলী খান আততায়ীর হাতে নিহত হলে পাঞ্জাবি গোলাম মোহাম্মদ গভর্নর জেনারেল হলেন, খাজা নাজিমউদ্দীন হলেন প্রধানমন্ত্রী। এবার কিন্তু সকল ক্ষমতা চলে গেল গভর্নর জেনারেলের হাতে, প্রধানমন্ত্রী পরিণত হলেন ক্ষমতাহীন শাসকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, খাজা নাজিমউদ্দীন বাঙালি হওয়ার কারণে প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও যেমন ক্ষমতা ভোগ করতে পারেননি তেমনি গভর্নর জেনারেল হিসেবেও ক্ষমতা ভোগ করতে পারেননি। যে তিনজন বাঙালি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, তার মধ্যে একমাত্র হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীই বাঙালির স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। অন্য দুজন মোহাম্মদ আলী এবং খাজা নাজিমউদ্দীন পশ্চিম পাকিস্তানিদেরই স্বার্থ রক্ষা করেছিলেন।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

১৯৪৭-৭০ সময়কালে মাত্র তেরো মাস (সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ থেকে অক্টোবর ১৯৫৭) সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানের রিপাবলিকান পার্টির সাথে কোয়ালিশন করে ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু যখনই সোহরাওয়াদী তার ক্ষমতা সংহত করার চেষ্টা করলেন, তখনই সামরিক সহায়তায় ইস্কান্দার মির্জা তাকে বরখাস্ত করে সর্বময় ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে পূর্ব বাংলায় ৩ এপ্রিল এ. কে. ফজলুল হক প্রাদেশিক সরকার গঠন করেন। পরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে ১৯৫৪ সালের ২৯ মে তার মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করা হয়। গভর্নরের শাসন জারির সাথে সাথেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনা কারণে গ্রেফতার করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়। ৬৫৯ জন সক্রিয় যুক্তফ্রন্ট কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। এভাবে পূর্ব বাংলায় গভর্নর ইস্কান্দার মির্জা কেন্দ্রের মদদে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন।

১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক আইন জারি করে এদেশের সকল প্রগতিশীল রাজনীতিককে রাজনীতি থেকে নির্বাসিত করে শোষণের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

ছয় দফা আন্দোলনের পেছনে সর্বাপেক্ষা ক্রিয়াশীল কারণটি ছিল পাকিস্তান সরকারের পূর্ব বাংলার প্রতি সীমাহীন অর্থনৈতিক শোষণ। দেশভাগের সময় ভারত থেকে অনেক মুসলমান ধনী ব্যবসায়ী যারা উত্তর প্রদেশ, বোম্বে ও দিল্লিতে ব্যবসা করতেন তারা তাদের পুঁজি নিয়ে করাচি বা লাহোরে গমন করেন। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজির প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে পূর্ব বাংলার হিন্দু মহাজন ও মারওয়ারি ব্যবসায়ীগণ দেশভাগের সময় তাদের মূলধন নিয়ে ভারতে চলে যায়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলা থেকে এভাবে হিন্দু বিত্তশালী ব্যবসায়ীদের চলে যাওয়াকে বাধা দেয়নি। অপরপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানে আগত রিফিউজি মুসলমানদের সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানেই ব্যবসা করতে উৎসাহিত করা হয়। এর ফলে একদিকে পুঁজিশূন্য হয়ে পূর্ব বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যে ধস নামে, অপরদিকে পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্য অবলীলায় অবাঙালি পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যবসায়ীগণ হস্তগত করতে সমর্থ হন। এর ফলে পাট ও তুলার রপ্তানি বাণিজ্য পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিদের হাতে চলে যায়।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

পূর্ব বাংলা ব্যবসা-বাণিজ্যে শুরুতেই পিছিয়ে পড়ে। এছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানে ফেডারেল রাজধানী, সকল প্রশাসনিক সদরদপ্তর স্থাপিত হওয়ায় রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিদ্যুৎ ও সেচখাতে ব্যয়ের মাধ্যমে স্বাধীনতার ২/৩ বছরের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তান অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যায়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার সময় যে ৩৮টি শিল্প কলকারখানা লাভ করেছিল তার মধ্যে পূর্ব বাংলায় ছিল ২০টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ১৮টি। কিন্তু যতই দিন যেতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও পূর্ব বাংলায় তেমন উল্লেখযোগ্য কলকারখানা গড়ে ওঠেনি।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য

শিক্ষাক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বৈষম্য

শিক্ষাক্ষেত্রেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য ছিল পাহাড়সম। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বেশি ছিল। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী বছরগুলোতে এ সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায়। পূর্ব পাকিস্তানে দারিদ্র্য বৃদ্ধি এবং শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কমে যাওয়াই এর মূল কারণ। পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৪৭-৫৫ সময়কালে ব্যয় করা হয়েছিল ১৫৩০ কোটি টাকা আর পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়েছিল ২৪০ কোটি টাকা। অন্য এক হিসেবে দেখা যায়, ১৯৫১-৬১ সময়কালে শিক্ষাখাতে পূর্ব পাকিস্তানে মাথাপিছু বরাদ্দ ছিল ৫.৬৩ টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল ৮.৬৩ টাকা অর্থাৎ উভয় অংশে ব্যয় বরাদ্দের ব্যবধান ৫৩%-এরও বেশি ছিল। উচ্চশিক্ষার জন্য যে সকল স্কলারশিপ পাওয়া যেত তার কোনোটিই পূর্ব পাকিস্তানি ছাত্র-ছাত্রী কিংবা গবেষকগণ পেতেন না, সবই পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্য বরাদ্দ দেয়া হতো।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন

টপিক – ০৪ ছয় দফা

ছয় দফা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

ছয় দফা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা ঘোষণা ছিল সংগ্রামের একটি স্তর থেকে অপর স্তরে উন্নীত হওয়ার মাইলফলকস্বরূপ। এটি ছিল এমন একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ দাবির সমষ্টি যা বিশ্বের বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ছয় দফা দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি শাসকবর্গকে এমন একটি রাজনৈতিক সংকটে ফেলে দিয়েছিলেন যা মোকাবিলা করার মতো বাস্তব যুক্তি তাদের হাতে ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানিরা বুঝেছিল, যদি ছয় দফা মেনে নেয়া হয় তাহলে বাঙালি অতিদ্রুত বিকশিত হয়ে এমন এক শক্তিশালী সমৃদ্ধ জাতিতে পরিণত হবে যাদের আর কোনো দিনও পদানত করা সম্ভব হবে না। তাই পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি অস্ত্রের ভাষায় মোকাবিলা করে। কিন্তু তা করতে গিয়ে ইতিহাসের অন্যতম কলঙ্কজনক পরাজয়ের স্বাদ তাদের গ্রহণ করতে হয়েছে।

ছয় দফা

ছয় দফা উত্থাপন

১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে পাকিস্তানের বিরোধী দলসমূহ তাসখন্দ চুক্তির বিরোধিতায় এক কনভেনশনে মিলিত হয়। এতে ৭৪০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে, যার বেশিরভাগই ছিল ডানপন্থি। পূর্ব পাকিস্তান থেকে এ সম্মেলনে মাত্র ২১ জন প্রতিনিধি অংশ নেয়ার জন্য এসেছিলেন। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ থেকে এসেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার অপর ৪ জন প্রতিনিধি। ৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদের নিয়ে 'বিষয় নির্বাচনী কমিটি'র সভায় ৬ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করে তা সম্মেলনের আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানান। কিন্তু 'বিষয় নির্বাচনী কমিটি' এ প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। পরদিন পশ্চিম পাকিস্তানের সকল পত্রিকায় ছয় দফার বিবরণ প্রকাশিত হয় এবং বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু উক্ত সম্মেলনে তার ছয় দফা উপস্থাপন করলে প্রবল হট্টগোলের সৃষ্টি হয়।' উপস্থিত ৭৩৫ জন সদস্যই এ প্রস্তাব উপস্থাপনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং সরাসরি তা নাকচ করে দেন।

ছয় দফা

ছয় দফা উত্থাপন

বঙ্গবন্ধু এরপর তাঁর প্রতিনিধিদল নিয়ে সভাস্থল পরিত্যাগ করে পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। পরদিন ৭ফেব্রুয়ারি ঢাকার সংবাদপত্রগুলোতে এ দাবিগুলোর সারসংক্ষেপ প্রকাশিত হলে আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতৃবৃন্দের অনেকে বিভ্রান্ত হন; অনেকে ক্ষুব্ধ হন। কেননা ছয় দফা দাবি সম্পর্কে তারা কিছুই জানতেন না এবং বঙ্গবন্ধু তাদের সাথে কোনো পরামর্শও করেননি। তবে আওয়ামী লীগের তরুণ নেতৃত্ব ছয় দফাকে সাদরে গ্রহণ করে। তারা প্রবীণ নেতৃবৃন্দের আপত্তি সত্ত্বেও ঢাকার দেয়াল 'বাঙালির দাবি ছয় দফা,' 'বাঁচার দাবি ছয় দফা', 'ছয় দফার মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন নিহিত' প্রভৃতি স্লোগান দ্বারা ভরে ফেলে। এই তরুণ নেতৃবৃন্দ ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ব্যানারে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে "আমাদের বাঁচার দাবি ছয় দফা কর্মসূচি" শীর্ষক পুস্তিকা বিলি করে, যাতে ছয় দফার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়। ১৩ মার্চ আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় এটি পাস হয়। এ সময় কতিপয় প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ প্রমুখ এর বিরোধিতা করেন।

ছয় দফা

ছয় দফা উত্থাপন

ছয় দফা অনুমোদিত হলেও তা দলের কাউন্সিল অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৯৬৬ সালের ১৮-১৯ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন বসে। এ সময় আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ। তিনি ছয় দফার বিরোধিতা করে সভাস্থল ত্যাগ করেন। এরপর সৈয়দ নজরুল ইসলাম সভার কাজ চালিয়ে যান। এ সভায় ছয় দফা অনুমোদিত হয়। এ সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। নতুন ওয়ার্কিং কমিটিও গঠিত হয়। ছয় দফাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব প্রবীণদের হাত থেকে তরুণদের হাতে চলে আসে।

ছয় দফা

ছয় দফা ধারাসমূহ

নিচে ১৯৬৯ সালে আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আবদুল মমিন কর্তৃক যেভাবে পুস্তিকাকারে ছয় দফা মুদ্রিত হয়েছিল তা উপস্থাপন করা হলো:

ছয় দফার রূপরেখা (Outline of Six-Point)

প্রস্তাব এক: শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি (State Nature and the Constitutional Framework) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমন হতে হবে যেখানে পাকিস্তান হবে ফেডারেশনভিত্তিক রাষ্ট্র সংঘ এবং এর ভিত্তি হবে লাহোর প্রস্তাব। আইন পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম এবং এই পরিষদও নির্বাচিত হবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণের সরাসরি ভোটে।

প্রস্তাব দুই: কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা (The Power of Central Government)

কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা কেবল দুটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে, যথা-দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাজ্যগুলোর ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

ছয় দফা

ছয় দফা ধারাসমূহ

প্রস্তাব তিন: মুদ্রা ও অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা (Currency and Monetary Power)

মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত যেকোনো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা চলতে পারে। (ক) সমগ্র দেশের জন্য দুটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে। অথবা, (খ) বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্য একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ফলপ্রসূ ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভের পত্তন করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক আর্থিক ও অর্থবিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

প্রস্তাব চার: রাজস্ব, কর ও শুল্কসম্বন্ধীয় ক্ষমতা (Revenue, Tax and Customs Administration Capacity)

ফেডারেশনের অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনোরূপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর সবরকম কর আদায় করার ক্ষমতা থাকবে। শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

ছয় দফা ধারাসমূহ

প্রস্তাব পাঁচ: বৈদেশিক বাণিজ্যবিষয়ক ক্ষমতা (The Power of Foreign Trade Affairs)

ক. ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে।

খ. বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর এখতিয়ারাধীন থাকবে।

গ. কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত হারে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোই মিটাবে।

ঘ. অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদির চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা করজাতীয় কোনো বাধা-নিষেধ থাকবে না।

ঙ. শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্ব-স্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

প্রস্তাব ছয়: আঞ্চলিক বাহিনী গঠনের ক্ষমতা (The Power of Formation of Regional Forces)

আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন করার ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

ছয় দফা

ছয় দফা প্রচারণা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জানতেন যে, শাসকগোষ্ঠী ছয় দফাকে সহজে মেনে নেবে না। এজন্য তিনি অতিদ্রুত এটি প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তিনি ১৯৬৬ সালের ২০ মার্চ থেকে ৮ মে পর্যন্ত ৫০ দিনে ৩২টি জনসভায় ভাষণ দিয়ে ছয় দফা ব্যাখ্যা করেন। এসময় পাকিস্তানি সরকার তাকে মুহুর্মুহু গ্রেফতার করে আর বঙ্গবন্ধু জামিন নিয়ে বেরিয়ে এসেই আরেকটি জনসভায় ভাষণ প্রদান করেন। এই ৫০ দিনের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানে ছয় দফার প্রতি যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয় তা রাজনৈতিক প্রচারণার ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। বঙ্গবন্ধুর এ বিরল সাফল্যের মূলে ছিল তার জ্বালাময়ী ভাষণের ক্ষমতা ও তেজোদীপ্ত ব্যক্তিত্ব। এছাড়া তিনি তরুণসমাজকে ব্যাপকভাবে উদ্দীপ্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তরুণসমাজের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব সৃষ্টি করেন যাতে একস্তরকে গ্রেফতার করলে অপর স্তরের নেতৃত্ব আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে পারে।

ছয় দফা

ছয় দফা প্রচারণা

তাই দেখা যায়, ৯ মে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হলে এবং ১০ মের মধ্যে তার দলের প্রায় ৩৫০০ জন নেতা-কর্মী গ্রেফতার হলেও ছয় দফার আন্দোলন থেমে থাকেনি। ছাত্র ইউনিয়নের সহায়তায় ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক ৫০,০০০ লিফলেট ছাপিয়ে বিলি করতে সক্ষম হন। ন্যাপের ছয় দফাপন্থি অংশের নেতৃবৃন্দ সংবাদপত্র থেকে ছয় দফার লিফলেট ছাপিয়ে দিতেন। এভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ছয় দফা ব্যাপক জনপ্রিয় দাবিতে পরিণত হয়। ৭ জুন ৬ দফা দাবির পক্ষে দেশব্যাপী তীব্র গণ-আন্দোলনের সূচনা হয়। এই দিনে আওয়ামী লীগের ডাকা হরতালে ঢাকা, টঙ্গী, নারায়ণগঞ্জে পুলিশ ও ইপিআরের গুলিতে মনু মিয়া, শফিক, শামসুল হক, মুজিবুল হকসহ মোট ১১ জন বাঙালি শহিদ হন।

ছয় দফা

ছয় দফার প্রক্রিয়ায় আইয়ুব খান

ছয় দফার প্রতি পাকিস্তান সরকারের মনোভাব ছিল অত্যন্ত কঠোর। লাহোরে ছয় দফা উত্থাপন করার পরদিন ৭ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের সকল পত্রপত্রিকা বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে অভিযুক্ত করে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এটিকে হিন্দু আধিপত্যবাদী যুক্তবাংলা গঠনের ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেন। ছয় দফার সমর্থকদের গোলযোগ সৃষ্টিকারী আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, পাকিস্তান ধ্বংস করার জন্য ছয় দফা ঘোষণা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ছয় দফা ঘোষণা করার পর আইয়ুব খান অস্ত্রের ভাষায় এর জবাব দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যখন ১৯৬৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন তখন স্ববিরোধী বক্তব্য রাখেন। ১৯৬৭ সালের মার্চে আইয়ুব খান ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বলেন, "বর্তমান সরকারের আমলে পূর্ব পাকিস্তান পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করছে। কেন্দ্রীয় সরকার এখন শুধু গভর্নর নিয়োগ ছাড়া প্রদেশের আর কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে না। এই ক্ষমতা কেন্দ্র থেকে নিয়ে নেয়া হলে দেশটি দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়বে।"

লক্ষ করার বিষয়, এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মনে হচ্ছে আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন সমর্থন করেছেন। কিন্তু ঠিক এর পরেই তিনি যা বলেন তা স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে তার সত্যিকার অবস্থান তুলে ধরে। একই বক্তৃতায় তিনি বলেন, "যারা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য চেঁচামেচি করছে তারা পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা কামনা করে। যদি এটা ঘটে তাহলে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে।"

ছয় দফা

ছয় দফার প্রক্রিয়ায় আইয়ুব খান

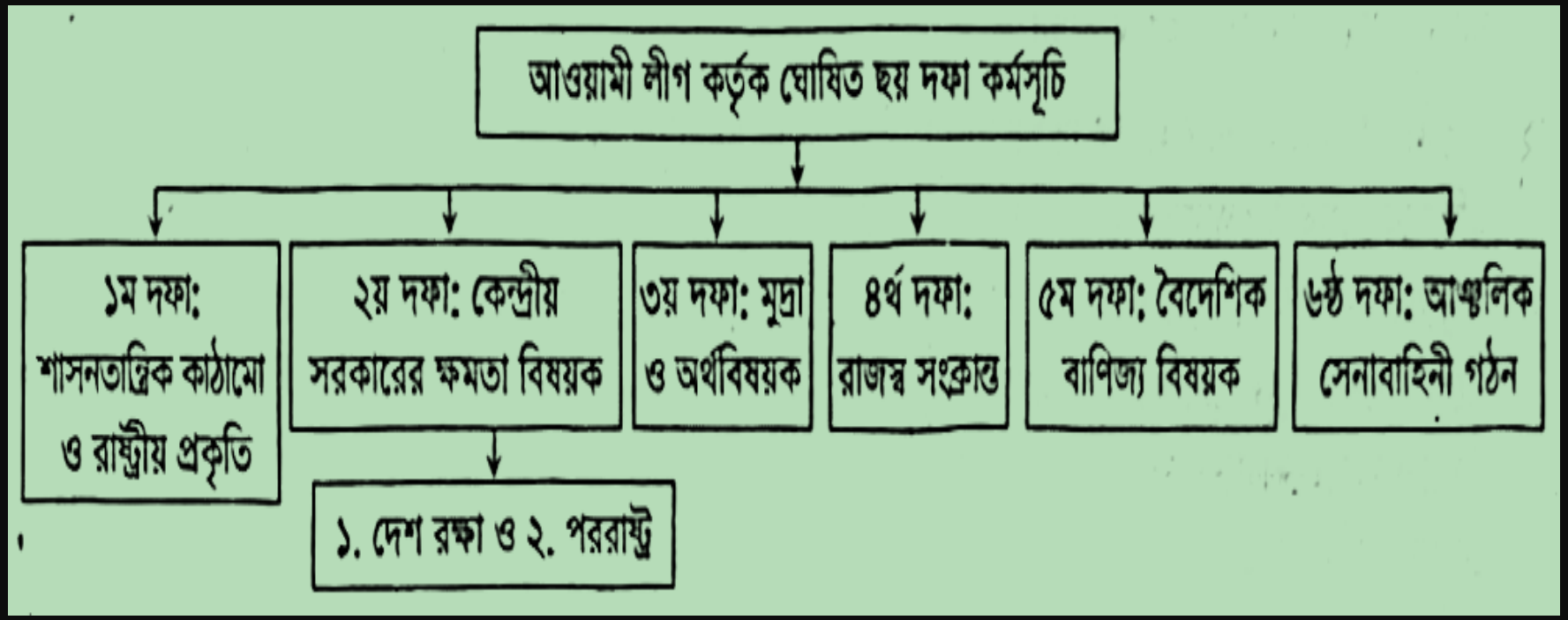

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন

টপিক – ০৫ ছয় দফার গুরুত্ব

ছয় দফার গুরুত্ব

This Topic is important for

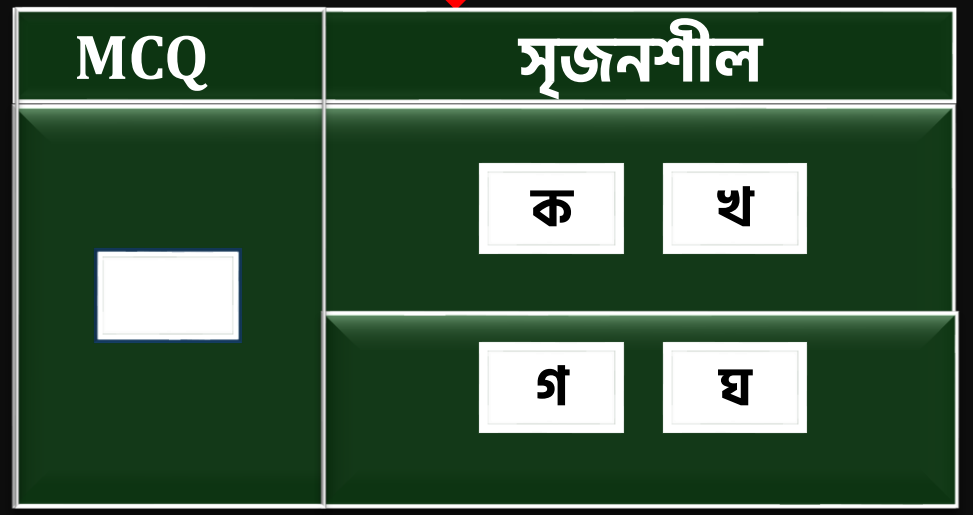

ছয় দফার গুরুত্ব

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ছয় দফা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলনের সূত্রপাতের মধ্য দিয়ে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনের মাধ্যমে সংগ্রামের নেতৃত্ব প্রবীণ রাজনীতিবিদদের হাত থেকে তরুণ সমাজের হাতে চলে আসে। আওয়ামী লীগ এ আন্দোলনের মাধ্যমে একটি পাঁতিবুর্জোয়া সমর্থিত সংগঠন থেকে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার রাজনৈতিক প্লাটফর্মে পরিণত হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একজন মধ্যম সারির জাতীয় নেতা থেকে দেশের প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। ছয় দফার মধ্যে যেভাবে অর্থনীতি, রাজনীতি ও সামরিক বিষয়গুলোকে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছিল তাতে সমগ্র বাঙালি জাতি তাদের সত্যিকার মুক্তির পথ খুঁজে পায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ছয় দফা তাই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। নিচে ছয় দফার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচিত হলো:

ছয় দফার গুরুত্ব

১. শোষণ পরিসমাপ্তির প্রতিশ্রুতি: ছয় দফা ছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিগত উনিশ বছরের অর্থনৈতিক শোষণ পরিসমাপ্তির অঙ্গীকার। এর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দফায় এমন সব সাংবিধানিক বিধিব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছিল যা বাস্তবায়িত হলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচার বন্ধ হয়ে যেত, দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যে পূর্ব পাকিস্তানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতো। এর ফলে কর্মসংস্থানসহ সকল ক্ষেত্রে এতদিন পশ্চিম পাকিস্তানের যে শোষণ প্রক্রিয়া চালু ছিল তা বন্ধ হয়ে যেত। এজন্য বঙ্গবন্ধু ছয় দফাকে 'আমাদের বাঁচার দাবি' বলে উল্লেখ করেছেন। পৃথক মুদ্রাব্যবস্থা, কর ও রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ে এদেশের এখতিয়ার, বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ ও বাণিজ্য চুক্তি করার অধিকার বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে এদেশের ভাগ্য এদেশবাসীই নির্ধারণ করতে সক্ষম হতো। এজন্য বঙ্গবন্ধু ছয় দফাকে বাংলার কৃষক, শ্রমিক, মজুর, মধ্যবিত্ত ও আপামর জনসাধারণের মুক্তির সনদ এবং বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চিত পদক্ষেপ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

ছয় দফার গুরুত্ব

২. বাঙালি জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশ: ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে। ইতিপূর্বে যেসব আন্দোলন হয়েছিল সেগুলো ছিল ইস্যু ভিত্তিক আন্দোলন এবং এসব আন্দোলনে শ্রমিক-কৃষক মেহনতি মানুষের সরাসরি পেশাগত কোনো বিষয় জড়িত ছিল না। কিন্তু ছয় দফা ছিল একটি ভারসাম্যমূলক দাবির সমষ্টি, যার মধ্যে দেশের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের পূর্ণ ও স্বাধীন বিকাশের প্রতিশ্রুতি ছিল। এ দাবিগুলো বঙ্গবন্ধু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সারাদেশ সফর করে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন তাতে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এটা বুঝতে সক্ষম হয় যে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান দুটি আলাদা সত্তা। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকবর্গ শুধু বাঙালি হওয়ার কারণেই পূর্ব পাকিস্তানিদের সকল ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকারে পরিণত করেছে। এর ফলে তাদের ওপর বিজাতীয় শাসন ও শোষণের চিত্রটি তারা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে। যার ফলে এক অভূতপূর্ব জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে।

ছয় দফার গুরুত্ব

৩. স্বায়ত্তশাসন দাবি: ইতোপূর্বে আরো অনেকেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের স্পষ্ট কোনো রূপরেখা কেউ উপস্থাপন করতে পারেননি। ছয় দফার মধ্য দিয়ে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রগুলোকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল বলে তা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সমর্থন পেতে সক্ষম হয়। ছয় দফায় স্বায়ত্তশাসনের দাবি এত বিশদভাবে ও জোরালোভাবে উত্থাপিত হয়েছিল যে, তা পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিয়েছিল।

৪. সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি: ছয় দফার প্রথম দফাতেই সার্বজনীন ও প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিনির্বাচনের ব্যবস্থা থাকায় তা গণতন্ত্রের প্রকৃত স্বাদ উপভোগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এছাড়া কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার প্রয়োগক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দেয়ায় গণতন্ত্রকে হত্যা করে স্বৈরতন্ত্র চালুর সকল সম্ভাবনার দুয়ার চিরতরে বন্ধ হয়েছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশের পথ হয়েছে উন্মুক্ত। এ কারণে ছয় দফা ছিল প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েমের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি।

৫. জাতীয় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা: ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এখানকার জানমালের নিরাপত্তা হয়ে পড়ে অরক্ষিত। ছয় দফার ষষ্ঠ দফায় আঞ্চলিক মিলিশিয়া বা আধা-সামরিক বাহিনী গঠন ও তা প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকার ব্যবস্থা পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তাকে অধিকতর সংহত করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। এর ফলে জনগণ নিরাপত্তাহীনতার আতঙ্ক থেকে মুক্তি পাবে বলে মনে করেছে।

ছয় দফার গুরুত্ব

৬. আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি: ছয় দফার পর আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠিত হয়। আওয়ামী লীগের তরুণ নেতৃত্ব এটিকে এক জনপ্রিয় সংগঠনে পরিণত করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের মনের কথাগুলোই ছয় দফার মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন। এর ফলে আওয়ামী লীগ অতিদ্রুত একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়।

৭. স্বাধীনতার বীজ: ছয় দফার মধ্যে একরূপ শিথিল কনফেডারেশনের কথা বলা হয়েছিল। এখানে যে পৃথক মুদ্রাব্যবস্থা, নিজস্ব আধা-সামরিক বাহিনী, পৃথক অর্থনীতির কথা হয়েছে, তা আসলে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলোরই কাছাকাছি। এর ফলে দেখা যাচ্ছে, ছয় দফা বাস্তবায়িত হলে বাঙালি জাতি একটি পৃথক সত্তা নিয়ে বেড়ে উঠতে সক্ষম হবে, বাঙালির ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রকার কর্তৃত্বের অবসান ঘটবে। ফলে অনেকে মনে করেন, ছয় দফা ছিল নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম পদক্ষেপস্বরূপ। বঙ্গবন্ধু নিজেও মুজাফফর আহম্মেদ ও রুহুল কুদ্দুসকে বলেছিলেন যে, ছয় দফা আসলে এক দফারই ভিন্ন প্রকাশ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন

টপিক – ০৬ (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য)

(রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য)

This Topic is important for

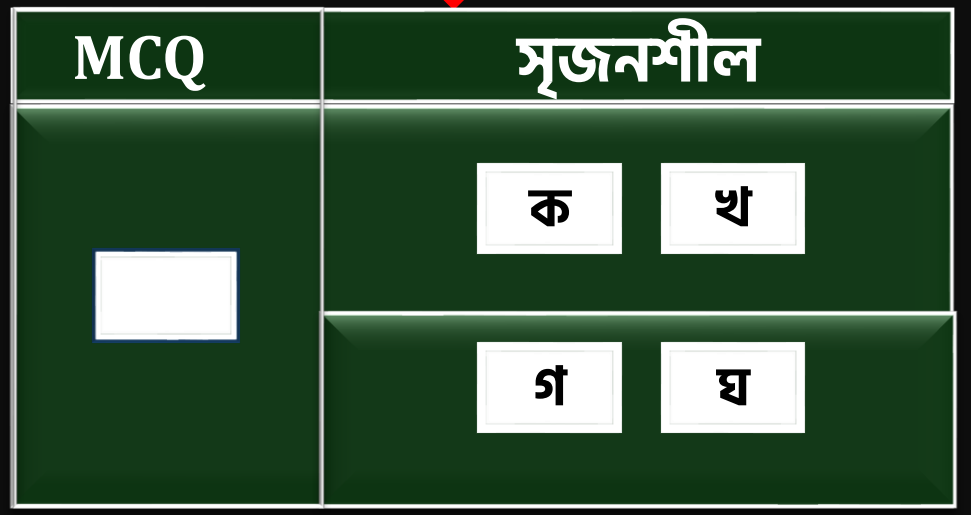

(রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৬৮ সালের আগরতলা মামলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মামলার মাধ্যমে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশদ্রোহী প্রমাণ করে তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার ধ্বংস করতে চেয়েছিল। কিন্তু এর ফল হয়েছে উল্টো। এ মামলার ফলে বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হয়নি, বরং তিনি বাংলার অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন। এমনকি ছয় দফা ঘোষণার পর যে মওলানা ভাসানী রহস্যজনক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তিনিও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য দাবি নিয়ে রাজপথে নেমে আসেন।

প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য থেকে একথা আজ প্রমাণিত হয়েছে যে, পঞ্চাশের দশক থেকেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করলে ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন আর্মি নামে যে গোপন সশস্ত্র সংগঠন গড়ে ওঠে, সে আন্দোলনের নেতারাও বঙ্গবন্ধুর সাথে যোগাযোগ রেখেছিল; তিনি তাদের অর্থ সাহায্য দিয়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

(রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য)

এ সময় পাকিস্তানের প্রশাসন, সামরিক বাহিনীর বাঙালি কর্মকর্তাদের সাথেও তিনি গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। পাকিস্তানের গোয়েন্দারা বিষয়টি অবগত ছিল, কিন্তু প্রমাণের অভাবে ব্যবস্থা নিতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুও এসব তৎপরতা তেমন জোরালো করতে পারেননি তার নেতা সোহরাওয়াদীর অনীহার কারণে।

আগরতলা মামলায় জেলখানা থেকে ট্রাইবুন্যালে যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু, ১৯৬৮

কিন্তু ১৯৬৩ সালে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু হলে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের নেতৃত্বভার গ্রহণ করে দলকে অতিদ্রুত তৃণমূল পর্যন্ত সংগঠিত করেন। তিনি বেছে বেছে মেধাবী ও সাহসী তরুণদের আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সংগঠিত করেন। অতঃপর তিনি ছয় দফা ঘোষণার পর দলের দোদুল্যমান প্রবীণ নেতাদের হটিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব একঝাঁক প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ নেতৃত্বের হাতে অর্পণ করেন। এদের মধ্যে ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মনসুর আলী প্রমুখ।

ছয় দফা ঘোষণার পর পূর্ব পাকিস্তানে সরকারবিরোধী আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন আখ্যা দিয়ে সরকার এ আন্দোলন দমন করার জন্য কঠোরতম পন্থা অবলম্বন করে। তারা বুঝতে পারে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব ধ্বংস করতে না পারলে এ সরকারবিরোধী আন্দোলন দমন করা যাবে না। এজন্য তারা বঙ্গবন্ধু ও তার সহযোগীদের দমন করার জন্য এক গভীর ষড়যন্ত্রের ছক প্রণয়ন করে।

১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে যে দেশের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে এবং এর সাথে জড়িত থাকার অপরাধে দুইজন আওয়ামী লীগ নেতা, দুইজন সরকারি কর্মকর্তাসহ ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এরপর সরকার ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে ৩৫ জন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আগরতলা মামলা নামে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দায়ের করে।" তাদের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করা হয় যে, তারা ভারতের সক্রিয় সহযোগিতায় অস্ত্র ও অর্থ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন 'করার জন্য ভারতের আগরতলায় এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এজন্য পরিকল্পিতভাবে ইতোপূর্বে গ্রেফতার হওয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৭ জানুয়ারি মুক্তি দিয়ে ১৮ জানুয়ারি ১৯৬৮ নতুন রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় গ্রেফতার করা হয়। ইতোপূর্বে ৭ জানুয়ারিতে দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় সরকারি বরাত দিয়ে এই বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যে অভিযুক্তরা আগরতলায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্নেল মিশ্র ও মেজর মেননের সাথে দেখা করেছিলেন। সরকারি রিপোর্টে বলা হয়, বহু অস্ত্রশস্ত্রের তালিকাসহ বহু দলিল তাদের হস্তগত হয়েছে। লক্ষণীয় যে, সরকার বলেছে, অভিযুক্তরা আগরতলায় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, অথচ তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে। সরকার গ্রেফতারকৃত ২৮ জনের একটি তালিকা প্রকাশ করে।

এ মামলায় পরবর্তীকালে যাদের অভিযুক্ত করা হয় তারা হলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (ফরিদপুর), সার্জেন্ট জহুরুল হক (নোয়াখালী), ক্যাপ্টেন শওকত আলী মিয়া (ফরিদপুর), সার্জেন্ট আবদুল জলিল (ঢাকা), লে. আবদুর রউফ (ময়মনসিংহ), মাহফুজ উল্লাহ (নোয়াখালী), ও নূর মোহাম্মদ (ঢাকা)।

গ্রেফতারকৃতদের বিশেষ সামরিক ট্রাইব্যুনালে বিচার করার ব্যবস্থা করা হয়। ২২ জানুয়ারি ১৯৬৮ আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী পরিষদ এক জরুরি সভায় মিলিত হয়ে বঙ্গবন্ধুকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগদানের জন্য গোপন বিচারের পরিবর্তে প্রকাশ্যে বিচারের দাবি জানায়। তারা অপর এক প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধুর স্বাস্থ্যগত অবস্থা এবং তাকে কোথায় রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে সরকারি প্রেসনোট দাবি করে।

(রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য)

আগরতলা মামলাকে ষড়যন্ত্র মামলা নামে অভিহিত করা হয় এটা বোঝানোর জন্য যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যরা ভারতের মাটিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্যরা যা করেছিলেন তা ষড়যন্ত্র ছিল না। পাকিস্তানের শাসকচক্রের শোষণ নির্যাতনের হাত থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে মুক্ত করার জন্য দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি অপরাপর উপায় নিয়েও বিভিন্ন পরিকল্পনা করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলা মামলার নাম দিয়েছিলেন 'ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা'। কিন্তু পাকিস্তান সরকার যেভাবে এবং যে প্রক্রিয়ায় অতিরঞ্জিত করে মামলাটি সাজিয়েছিল এবং বিচার প্রক্রিয়া যেভাবে করতে চেয়েছিলো তা স্বচ্ছ ও ন্যায়সঙ্গত ছিল না। ফলে এ মামলা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পায়নি, বরং মুজিব ও অন্যান্যদের প্রতি গণসমর্থন বৃদ্ধি পেয়েছে।

(রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য)

১৯৬৮ সালের ১৯ জুন দেশি-বিদেশি সাংবাদিক এবং টেলিভিশনকর্মীর সামনে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কুর্মিটোলা সেনানিবাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারকার্য শুরু হয়।" এ মামলার নাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য'। একই দিন সার্জেন্ট জহুরুল হকের বিরুদ্ধে আরেকটি চার্জশিট প্রদান করা হয়। বিচারকার্য শুরু হলে আদালতে বঙ্গবন্ধু এক দীর্ঘ বিবৃতির মাধ্যমে তার সংগঠন ও পাকিস্তানের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন।

সরকার শুরুতে মামলার ব্যাপারে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করলেও পরবর্তীকালে চূড়ান্ত গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করে। সরকার ভেবেছিল, সংবাদপত্রে মামলার বিবরণ প্রকাশিত হলে জনগণ বঙ্গবন্ধুর ওপর ক্ষিপ্ত হবে; ফলে বঙ্গবন্ধু ও তার সংগঠনের রাজনৈতিক অপমৃত্যু ঘটবে। এজন্য সরকার মামলার বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশে বাধা প্রদান করেনি।

প্রতিদিন সংবাদপত্রের পাতায় রাজবন্দি বঙ্গবন্ধুর জবানবন্দি এবং জেরা প্রকাশিত হতে থাকলে এসব বর্ণনা পড়ে প্রতিটি বাঙালি বঙ্গবন্ধুর প্রতি ক্রমে সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে এবং বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে মামলা তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই মামলা বলে মনে করতে থাকে। হাটে-ঘাটে-মাঠে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, রাস্তায়-রেস্তোরাঁয় এমনকি খেলার মাঠেও এ মামলা নিয়ে প্রতিদিনই আলোড়ন সৃষ্টি হতে থাকে। মানুষ ক্রমেই সরকারের ওপর ক্ষিপ্ত হতে থাকে। সর্বত্র এ মামলা পাকিস্তান সরকারের এক সাজানো নাটক হিসেবে অভিহিত হয়।

(রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য)

ঐতিহাসিক আগরতলা মামলায় যেসব দলিল দাখিল করা হয়েছিল

১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তান সরকার উল্লেখ করেছিল যে, ষড়যন্ত্রের অনেক দলিল তাদের হস্তগত হয়েছে, অথচ মামলার চার্জশিটের সাথে যেসব দলিল দাখিল করা হয়েছিল তা ছিল নিম্নরূপ:

১. 'আলো' এবং 'এম' ছদ্মনামে লেখা বেশ কিছু চিঠি।
২. 'বাংলাদেশ', 'বেতার বাণী' এবং 'বেঙ্গল এয়ার ফোর্স' শব্দ বিশিষ্ট কয়েক টুকরো কাগজ।
৩. পূর্ব পাকিস্তানের ভাঁজ করা একটি মানচিত্র।
৪. 'নোয়াব আলী নামে' একজন মোটরচালকের চারিত্রিক সনদ।
৫. ঢাকা-দাউদকান্দি ফেরিঘাটের 'লগবই'।
৬. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের হিসেব-নিকেশ।
৭. সাক্ষীদের নামের তালিকাসহ ২০০টি দলিল।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন

টপিক – ০৭ ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার বিচার প্রক্রিয়া

ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার বিচার প্রক্রিয়া

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার বিচার প্রক্রিয়া

মামলা দায়ের (Submission of the Case)

১. ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি সরকার প্রেসনোটের মাধ্যমে জানায় যে, পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য একটি ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে এবং এ কাজে জড়িতদের গ্রেফতার করা হয়েছে। পরদিন সংবাদপত্রে ২ জন সিএসপি অফিসারসহ ৮ জন গ্রেফতারকৃত অভিযুক্তের তালিকা প্রকাশিত হয়।

২. ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ আরও কয়েকজনকে নিয়ে মোট ৩৫ জনকে অভিযুক্ত করা হয়। এদিনের এক সরকারি প্রেসনোটে জানা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলা ষড়যন্ত্রের মূল হোতা। বঙ্গবন্ধু পূর্বেই প্রতিরক্ষা আইনে গ্রেফতার হয়ে বন্দি ছিলেন। ১৭ জানুয়ারি তাকে মুক্তি দিয়ে ১৮ জানুয়ারি 'আর্মি, নেভি অ্যান্ড এয়ার ফোর্স অ্যাক্ট'-এ পুনরায় গ্রেফতার করা হয়।১৮

ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার বিচার প্রক্রিয়া

আইন সংশোধন (Amendment of Law)

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করায় তাদের প্রকাশ্য বিচারের জন্য প্রবল দাবি উত্থাপিত হয়। এর ফলে আইয়ুব সরকার ১৯৬৮ সালের ১২ এপ্রিল আগরতলা মামলার বিচার পরিকল্পনার জন্য আইন ও বিচারসংক্রান্ত এক ফৌজদারি অধ্যাদেশ জারি করে। সেখানে বলা হয়-

১. মামলার বিচার সাধারণ আদালতের পরিবর্তে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে পরিচালিত হবে;

২. সুপ্রিম কোর্টের একজন জজ (চেয়ারম্যান) এবং হাইকোর্টের ২ জন জজের (সদস্য) সমন্বয়ে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হবে;

৩. পুলিশের নিকট প্রদত্ত স্বীকারোক্তি আইনসম্মত হবে;

৪. আসামিদের কোনো জামিন দেয়া যাবে না এবং তাদেরকে সামরিক হেফাজতে রাখা হবে;

৫. বিশেষ আদালতের এখতিয়ার নিয়ে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না।

ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার বিচার প্রক্রিয়া

ট্রাইব্যুনাল গঠন (Formation of Tribunal)

আইয়ুব খানের জারিকৃত অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ১৯৬৮ সালের ২২ এপ্রিল বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয় পাকিস্তানের সাবেক বিচারপতি এস এ রহমানকে। অপর দুজন বিচারপতি হলেন সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি এম. আর. খান এবং পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের বিচারপতি মকসুমুল হাকিম। শেষোক্ত দুজন ছিলেন সদস্য। মামলায় সরকার পক্ষের প্রধান কৌসুলি নিয়োগ করা হলো পাকিস্তানের এককালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পাঞ্জাবি আইনজীবী মঞ্জুর কাদেরকে।

আসামিপক্ষের আইনজীবী (Lawyers of the Accused)

আগরতলা মামলায় অভিযুক্তদের পক্ষে আইনি লড়াই করার জন্য ব্রিটেন প্রবাসী বাঙালিরা যুক্তরাজ্যের রানির আইনবিষয়ক উপদেষ্টা স্যার টমাস উইলিয়ামকে নিযুক্ত করেন। তাকে সহায়তা করার জন্য প্রখ্যাত আইনজীবী আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে ড. আলীম আল রাজী, আতাউর রহমান খান, অ্যাডভোকেট জুলমত আলী, মোল্লা জালাল উদ্দিন, মওদুদ আহমদসহ আরও অনেকে অংশগ্রহণ করেন।

ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার বিচার প্রক্রিয়া

আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ (Allegation Against the Accused)

১৯৬৮ সালের ১৯ জুন, কুর্মিটোলা সেনানিবাসে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে বিচারকাজ শুরু হয়। এতে সরকার পক্ষ ৪২ পৃষ্ঠার একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগপত্র উপস্থাপন করে। অভিযোগপত্রে বলা হয়, অভিযুক্তরা ভারত কর্তৃক সরবরাহকৃত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং তহবিলের সহায়তায় একটি সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করেছেন। মামলার প্রধান আসামি করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তার বিরুদ্ধে ১৬টি অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনের পর অভিযুক্তদের পক্ষের আইনজীবীদের মামলা পরিচালনার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য চার সপ্তাহ সময় দিয়ে মামলাটি মুলতুবি রাখা হয়।

ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার বিচার প্রক্রিয়া

কিছুদিন পর মামলা পুনরায় শুরু হলে প্রথমেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার সংগঠনের ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসের বিভিন্ন দিক বর্ণনা করে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন- "..১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধ চলাকালে যেসকল রাজনীতিবিদ ভারতীয় আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন আমি তাহাদের অন্যতম।... যুদ্ধাবসানে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রদেশ ভ্রমণকালে আমি ও অন্যান্য রাজনীতিবিদগণ আমন্ত্রিত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি। সেই সময় আমি পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও যুদ্ধকালে আমাদের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রদেশকে সামরিক প্রতিরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন জানাই। কারণ যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান দেশের অন্য অংশসহ সকল বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য সরকারি নেতৃবৃন্দ ও সরকারি প্রশাসনযন্ত্র আমাকে 'অস্ত্রের ভাষায়' 'গৃহযুদ্ধ' ইত্যাদি হুমকি প্রদান করে এবং একযোগে এক ডজনেরও অধিক মামলা দায়ের করিয়া আমাকে হয়রানি করিতে শুরু করিল... ছয় দফার ভিত্তিতে, পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চাকরির সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতার ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও নিষ্পেষণ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য

ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার বিচার প্রক্রিয়া

।...এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কোনো ব্যক্তির সহিত কোনো আলোচনা আমার অথবা জনাব তাজউদ্দীনের বাসায় সংঘটিত হয় নাই।.." বঙ্গবন্ধু মামলার টেকনিক্যাল দিক তুলে ধরে বলেন: "..একজন প্রাক্তন মন্ত্রী হিসেবে অর্জিত' অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি স্বরাষ্ট্র বিভাগের উক্ত প্রচারপত্র সম্বন্ধে একথা জানাইতে চাই যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগের সচিব কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে দলিলপত্র পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হওয়া ব্যতিরেকে কোনো বিভাগ হইতে কোনো প্রকার প্রচারপত্র প্রকাশ করা যায় না।.."

ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার বিচার প্রক্রিয়া

আগরতলা মামলায় পাকিস্তান সরকারের পক্ষে জেরাকারী ছিলেন আইয়ুব খানের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের তৎকালীন অফিসার এস. এম. মোস্তাফিজুর রহমান। এ মামলা সম্পর্কে তিনি পরবর্তীকালে লিখিত তার পুস্তক 'রণ থেকে জন'-এ উল্লেখ করেছেন, "মামলার তদন্তে আগরতলা মামলার অনেক দলিল ও তথ্যাদি পাওয়া গিয়েছিল। আজকের গৌরবের কাহিনি হিসেবে তা আমাদের কাছে বিরাজমান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হয়তো এই পরিকল্পনার প্রাথমিক অবস্থায় কিছু খুঁটিনাটি দিকে জড়িত ছিলেন, এর বেশি কিছু তার বিরুদ্ধে পাওয়া যায়নি। তবে আমার অভিমত ছিল এই মামলায় বঙ্গবন্ধুকে না জড়ানোর। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান ছাড়লেন না। তিনি ভাবলেন বঙ্গবন্ধুকে 'শায়েস্তা' করার জন্য মোক্ষম অস্ত্র পাওয়া গেছে, এ সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। তিনি ভেবেছিলেন, আগরতলা মামলার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে শেষ করে দেয়া যাবে। কিন্তু মোনায়েম খানের চিন্তা ছিল ভুল। খুব দ্রুতই এর বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অবস্থান গ্রহণ করে এবং পরিণতিতে বঙ্গবন্ধু বীর হিসেবে জেল থেকে বেরিয়ে আসেন।" ঐতিহাসিক আগরতলা মামলাকে ষড়যন্ত্র মামলা বলা যাবে না, কেননা এ মামলায় যারা অভিযুক্ত ছিলেন তারা ষড়যন্ত্র করেননি; তারা দেশের মুক্তির জন্য লড়াইয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন। পাকিস্তানিদের দৃষ্টিতে তারা দেশদ্রোহী হতে পারেন, কিন্তু বাঙালি জাতির কাছে তারা দেশপ্রেমিক।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন

টপিক – ০৮ ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

জানুয়ারির ঘটনাবলি ১৯৬৯

১১-দফা ঘোষণার পর ছাত্র আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। ১৯৬৯ সালের ১৭ এবং ১৮ জানুয়ারি বিক্ষোভ ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সরকারও ১৪৪ ধারা জারি করে রাখে। পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী ২০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা থেকে মিছিল বের হওয়ার কথা ছিল। এদিন ছাত্ররা হাতে হাতে লাঠি নিয়ে আসে। বটতলা থেকে মিছিলটি শহিদ মিনার পার হওয়ার সময় পুলিশি বাধার মুখে পড়ে। মিছিলে যারা ছিল তাদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ বাঁধলে পুলিশ ইন্সপেক্টর গুলি করে। ফলে ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন গ্রুপ) নেতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র আসাদুজ্জামান মৃত্যুবরণ করেন। সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ আসাদের মরদেহ এক নজর দেখার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে চলে আসে। ২:৩০ মিনিটে ছাত্ররা মেডিক্যাল কলেজের সামনে এক শোকসভায় মিলিত হয়। এরপর একটি বিরাট শোক মিছিল বের হয় যার অগ্রভাগে ছিল ইডেন কলেজের মেয়েরা। কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ আসাদের মৃত্যুতে ৩টি কর্মসূচি ঘোষণা করে- ২১ জানুয়ারি ঢাকায় হরতাল, ২২ জানুয়ারি শোক দিবস এবং ২৩ জানুয়ারি মশাল মিছিল। ২৪ জানুয়ারি পূর্বঘোষিত হরতালে ঢাকা শহরের সর্বস্তরের মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। সরকার শহরে সেনাবাহিনী মোতায়েন করে।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

জানুয়ারির ঘটনাবলি ১৯৬৯

৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

জানুয়ারির ঘটনাবলি ১৯৬৯

এমন অকুতোভয় দৃশ্য ইতোপূর্বে আর কেউ দেখেনি। পল্টনে লাখ লাখ মানুষ জড়ো হয়। ভীত হয়ে সরকার গভর্নর হাউসের চারিদিকে ট্যাংক ও কামান মোতায়েন করে। জনতা এতটাই উন্মুক্ত হয়ে ওঠে যে, তারা যেকোনো মুহূর্তে গভর্নর হাউস আক্রমণ করতে পারে এবং তাতে বিপুল রক্তক্ষয় ঘটতে পারে- এ আশঙ্কায় ছাত্রনেতারা জনতাকে ইকবাল হলের দিকে ধাবিত হওয়ার আহ্বান জানান। সেখানে একের পর এক ছাত্রনেতারা বক্তৃতা করেন। এ সভায় শহিদ মতিউরের পিতা সমবেত জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা করে লাখ লাখ ছাত্র-জনতাকে মতিউর বলে সম্বোধন করেন। এ সভা থেকে পরের দিন ২৫ জানুয়ারি পুনরায় সর্বাত্মক হরতাল ঘোষণা করা হয়।

এদিন সন্ধ্যায় বেতার ও টেলিভিশনে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্ট কালের জন্য সান্ধ্য আইন জারি করেন। সেইসাথে তিনি শহরের নিয়ন্ত্রণভার সেনাবাহিনীর ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে বলে ঘোষণা দেন। ২৫ জানুয়ারি ই.পি.আর. এবং সেনাবাহিনী প্রাদেশিক রাজধানীতে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করে। তারা নির্বিচারে গুলি করতে থাকে। তেজগাঁওয়ের নাখালপাড়ায় এক গৃহিণী মা তার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলি ১৯৬৯

১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান বেশ নমনীয় মনোভাব দেখান। তিনি তার ভাষণে আলোচনার প্রস্তাব দেন। কিন্তু ছাত্রসংগ্রাম পরিষদসহ সকল রাজনৈতিক দল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ওয়ালী খান, ভুট্টোসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি ব্যতীত কোনো আলোচনার সম্ভাবনা নাকচ করে দেয়। পরিস্থিতি সরেজমিনে প্রত্যক্ষকরণ এবং আলোচনার জন্য আইয়ুব খান ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা আসেন।

এ উপলক্ষে ঢাকায় সকল যানবাহন, দোকান-পাট ও দেয়ালে 'আইয়ুব ফিরে যাও' স্লোগানে ভরে ফেলা হয়। সর্বত্র কালো পতাকাও উত্তোলন করা হয়। পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে জড়ো হয়। এ সমাবেশে ছাত্রনেতারা সকল আলোচনার পূর্বশর্ত হিসেবে সকল রাজবন্দির মুক্তি দাবি করে। ৯ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ শপথ দিবস পালন করে। এ উপলক্ষে পল্টন ময়দানে আয়োজিত জনসভায় ছাত্ররা ১১-দফা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য শপথগ্রহণ করে। এক বিশেষ প্রস্তাবে তারা গভর্নর মোনায়েম খানের পদত্যাগ দাবি করে। এছাড়া ঢাকার বিভিন্ন সড়ক ও বিষয়ের নাম পরিবর্তন করা হয়। আইয়ুব নগরের নাম পাল্টে রাখা হয় শের-ই-বাংলা নগর, আইয়ুব চিলড্রেনস পার্কের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় মতিউর শিশু পার্ক।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলি ১৯৬৯

আলোচনার আহ্বানে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সাড়া না দেয়ায় আইয়ুব খান ১২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ত্যাগ করেন। এসময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যেহেতু আগরতলা মামলার সাথে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিষয়টি জড়িত, এ মামলা প্রত্যাহার করা হবে না। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ 'ডাক' (Democratic Action Committee)-এর আহ্বানে, পাকিস্তানের উভয় অংশে হরতাল পালিত হয়। উভয় প্রদেশে একযোগে হরতাল পালনের এই ঘটনা ছিল নজিরবিহীন। এতে আইয়ুব খানের নিয়ন্ত্রণ ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। এ উপলক্ষে 'ডাক' একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করেছিল। এতে ছিল:

আইয়ুব খান

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলি ১৯৬৯

"স্বাধীনতা লাভের একুশ বছর পরেও আমাদের কোনো সমস্যার সমাধান হয় নাই। জনগণের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয় নাই বটে, কিন্তু মাত্র বিশ-বাইশটি পরিবারের হাতে দেশের ধন-দৌলতের চার ভাগের তিন ভাগ জমা হইয়াছে। পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অস্বীকার করা হইয়াছে। আইয়ুবশাহীর গোলামির জিঞ্জির হইতে মুক্তিলাভ করা ও দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক শাসন ও সমাজ প্রতিষ্ঠাই এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। এই জন্য যে গণঐক্য ও শৃঙ্খলাবদ্ধ গণআন্দোলন প্রয়োজন তাহা কোনো দলের একক প্রচেষ্টায় গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়। তাই আটটি রাজনৈতিক দল এই মহান দায়িত্ব পালনের জন্য আগাইয়া আসিয়াছে এবং যুক্তভাবে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ গঠন করিয়াছে। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখের হরতালকে সর্বপ্রকারে সফল করিয়া তুলুন। একথা মনে রাখিবেন- এই হরতালের সফলতার ওপর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অনেক কিছুই নির্ভর করে।"

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলি ১৯৬৯

১৫ ফেব্রুয়ারি এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। এদিন আগরতলা মামলার আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরস্থ জেলখানায় গুলি করে হত্যা করা হয়। কিন্তু সরকার প্রেসনোটে জানায় যে আসামি পালাতে চেষ্টা করলে গুলি করা হয়। সরকারের এ হিংস্র আচরণে জনতা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ঠিক এই সময় মওলানা ভাসানী আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করে রাস্তায় নেমে আসেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি পল্টন ময়দানে বিক্ষুব্ধ জনতার উদ্দেশে তিনি বলেন যে প্রয়োজনে ফরাসি বিপ্লবের মতো জেলের তালা ভেঙে তিনি বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করে আনবেন। সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ জনতা স্লোগান দিয়ে ওঠে: 'জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব।'

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলি ১৯৬৯

মওলানা ভাসানীর ইমামতিতে জনতা সার্জেন্ট জহুরুল হকের নামাজের জানাজা শেষ করে পুরো শহরে ছড়িয়ে পড়ে। জনতা পুরো ঢাকা শহরে বিভিন্ন সরকারি অফিসে অগ্নিসংযোগ করে। প্রাদেশিক যোগাযোগ মন্ত্রী সুলতান আহম্মেদের সরকারি বাসভবনে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনের বাসভবন, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি খাজা হাসান আসকারীর বাসভবন, আগরতলা মামলার বিচারপতি এস. এ. রহমানের বাসভবন জনতা আক্রমণ করে পুড়িয়ে দেয়। এসবই ছিল মওলানা ভাসানীর 'ঘেরাও' ডাকের ফল। পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক সরকার আবার সান্ধ্য আইন জারি করে। ইতোমধ্যে এ আন্দোলন ঢাকা থেকে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহীতে ব্যাপক প্রতিবাদ সংঘর্ষের একপর্যায়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহাকে গুলি করা হয়। ঢাকায় এ খবর ছড়িয়ে পড়লে রাতের বেলায় মানুষ পাগলের মতো সান্ধ্য আইন উপেক্ষা করে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। সেনাবাহিনীর বুলেটের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ছাত্র-জনতা ঢেউটিন নিয়ে রাস্তায় নামে।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলি ১৯৬৯

অসংখ্য মানুষ এদিন পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. জোহার হত্যাকান্ড সারাদেশে এমন গণবিক্ষোভ সৃষ্টি করে যে সারা দেশ কার্যত অচল হয়ে পড়ে। অবশেষে জেনারেল আইয়ুব খান বুঝতে পারেন যে তার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। পশ্চিম পাকিস্তানে এসময় 'এক ইউনিট' বাতিলের দাবিতে জনতা উত্তাল হয়ে ওঠে। ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে ৩৪ জন অভিযুক্ত নেতাকে মুক্তি দেয়া হয়। এছাড়া বহু রাজবন্দি যারা কমিউনিস্ট হওয়ার কারণে দীর্ঘদিন যাবৎ জেলে ছিলেন তারাও মুক্তিলাভ করেন। মুক্তি পেয়েই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রদের ১১-দফার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন।

ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলি ১৯৬৯

তিনি বলেন, ১১-দফার মধ্যে তার ছয় দফা রয়েছে। এভাবে ছাত্রদের ১১-দফা আন্দোলন প্রাথমিক বিজয় লাভ করে। ২৩ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুর মুক্তি উপলক্ষ্যে রেসকোর্সের ময়দানে একটি গণসংবর্ধনা এবং অন্যান্য রাজনীতিবিদদের মুক্তি উপলক্ষ্যে পল্টনে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে। রেসকোর্সের জনসভায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সকল গ্রুপ এবং এনএসএফের নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শেষে সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে পরিষদের সভাপতি তোফায়েল আহমেদ কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৬৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের রাজধানী রাওয়ালপিন্ডিতে প্রথম দফায় রাজনীতিবিদদের সাথে আইয়ুব খানের গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মোজাফফফফর আহমদ, বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মুর্শেদসহ পূর্ব পাকিস্তানের অনেকেই অংশ নেন। কিন্তু মওলানা ভাসানী এ বৈঠক বয়কট করেন। তিনি এমনকি বঙ্গবন্ধুকে এ বৈঠকে অংশ নিতে নিষেধ করেন। প্রথম দফা আলোচনা ব্যর্থ হয়।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

মার্চের ঘটনাবলি ১৯৬৯

১০ মার্চ দ্বিতীয় দফা গোলটেবিল বৈঠকে বঙ্গবন্ধু তার ছয় দফা এবং ছাত্রদের ১১-দফা দাবি উপস্থাপন করেন। এ বৈঠকে জামায়াতে ইসলামির মওলানা মওদুদী এবং নেজামে ইসলামির মোহাম্মদ আলী বঙ্গবন্ধুকে আওয়ামী লীগের ছয় দফা এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১-দফা উত্থাপন করতে নিষেধ করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। এ আলোচনায় পূর্ব পাকিস্তানের মুজাফফর আহমদ, বিচারপতি মোর্শেদ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের খান আবদুল ওয়ালী খান বঙ্গবন্ধুর স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাব সমর্থন করেন। আইয়ুব খান দুটি বিষয় মেনে নেন- (ক) ফেডারেল সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, (খ) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচন। আওয়ামী লীগ এবং ন্যাপ (মোজাফফর) ব্যতীত অপর দলগুলো আইয়ুব খানের এ প্রস্তাব মেনে নেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ছয় দফা এবং ১১-দফার বাইরে কিছু মানতে অস্বীকার করেন। ফলে আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। জামায়াতে ইসলামী এ বৈঠককে সফল বলে অভিহিত করে। আইয়ুব খান এ গোলটেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্তকে ঐতিহাসিক বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ১৪ মার্চ এক সংবাদ সম্মেলন করে 'ডাক' থেকে আওয়ামী লীগকে প্রত্যাহার করে নেন। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধু এবং মোজাফফর আহমদের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানায়। এরপর ঢাকায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে প্রতিবাদ মিছিল বের হয়।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

মার্চের ঘটনাবলি ১৯৬৯

অপরদিকে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে 'ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এরা ছয় দফা এবং ১১-দফার বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে। ২১ মার্চ ১৯৬৯ বঙ্গবন্ধু ছয় দফা এবং ১১-দফার আলোকে পাকিস্তানের সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনীর খসড়া প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের নিকট পেশ করেন। এ খসড়া সংশোধনী পশ্চিম পাকিস্তানের অনগ্রসর অংশগুলো সমর্থন করলে আইয়ুব খান শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। কেননা এতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার এবং সেনাবাহিনীর ক্ষমতা সংকোচনের কথা বলা হয়েছিল। এমতাবস্থায় বিরোধী ছাত্রদের নিয়ে ছাত্র-শ্রমিক আন্দোলন শুরু করে। তারা পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ভেঙে ৪টি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের দাবি জানাতে থাকে। এদিকে ১৯ মার্চ তারিখে মোনায়েম খানের পদত্যাগের দাবিতে ছাত্রসমাজ ২৫ মার্চ সারাদেশে হরতাল আহ্বান করলে গভর্নর মোনায়েম খান সপরিবারে ঢাকা থেকে পলায়ন করেন। ২২ মার্চ এ এন হুদাকে নতুন গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার পরিবর্তে আরও অবনতি ঘটে। আইয়ুব খান অবশেষে ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন

টপিক – ০৯ গণঅভ্যুত্থান ও মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

গণঅভ্যুত্থান ও মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

গণঅভ্যুত্থান ও মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদ। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি অনন্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। মূলত তার রাজনীতির লক্ষ্য ছিল কৃষক-শ্রমিক, সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নতির জন্য কাজ করা।

মওলানা ভাসানী ১৮৮০ সালে সিরাজগঞ্জের ধনপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তিনি পিতামাতাকে হারান। স্থানীয় স্কুল ও মাদরাসায় অধ্যয়ন ছাড়া তার বিশেষ কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। মওলানা ভাসানী ইরাক থেকে আগত ধর্মীয় সাধক সৈয়দ নাসিরুদ্দীন বাগদাদীর সাহচর্যে আসেন। সেখানে তিনি মুসলিম ধর্মীয় শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করেন। ধর্মশাস্ত্রে আরও বেশি জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে ভারতের বিখ্যাত ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেওবন্দে গমন করেন। সেখানে তিনি ১৯০৭-১৯০৯ সাল পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৯৭ সালে মওলানা ভাসানী আসাম গমন করেন। সেখানে স্থানীয় জমিদারি কাজের সূত্রে কলকাতায় নিয়মিত যাতায়াতের কারণে তিনি স্বরাজপন্থিদের সংস্পর্শে আসেন। স্বরাজপন্থিদের কাছ থেকেই তিনি স্বাধীনতার আদর্শে উজ্জীবিত হন। ১৯১৬-১৯১৭সময়কালে আসামে থাকাকালীন তার রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। ১৯১৯ সালে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। ভারতবর্ষের খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিয়ে দশ মাস কারাভোগ করেন মওলানা ভাসানী। ১৯২৬ সালে আসামে তিনি প্রথম 'কৃষক প্রজা আন্দোলনের' সূত্রপাত ঘটান।

গণঅভ্যুত্থান ও মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

গণঅভ্যুত্থান ও মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

মওলানা ভাসানী ১৯২৯ সালে আসামের ভাসান চরে কৃষকদের সংগঠিত করে একটি সম্মেলন করেন। তিনি কৃষকদের পক্ষে বিভিন্ন সময়ে অত্যাচারী জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে কৃষক সম্মেলন ও সমাবেশ আয়োজন করেন। এজন্য জমিদার-জোতদাররা সবসময় ভাসানীকে তাদের নিজ নিজ এলাকায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন। ভাসানচরের জনসাধারণ তাকে 'ভাসানী' খেতাব প্রদান করে। ১৯৩৭ সালে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। আসামে গণবিরোধী 'লাইন প্রথা' চালু হলে তিনি এই নিপীড়নমূলক প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্বে দান করেন। তার আন্দোলন সংগ্রামের প্রভাবে ক্রমে আসাম প্রদেশে মুসলিম লীগের ভিত সুদৃঢ় হতে থাকে।

১৯৪৪ সালে মওলানা ভাসানী আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। দীর্ঘ ১১ বছর তিনি আসাম আইনসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৪৭ সালে তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শামিল হন। দেশবিভাগের সময় পূর্ব বাংলার সিলেট অঞ্চল পাকিস্তান না ভারতের সঙ্গে যাবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। এ সমস্যা সমাধানের জন্য গণভোট (Referendum) অনুষ্ঠিত হয়। মওলানা ভাসানীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে সিলেটের বেশিরভাগ মানুষ পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার পক্ষে রায় দেয়।

গণঅভ্যুত্থান ও মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

১৯৪৮ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পূর্ববাংলার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হলে মওলানা ভাসানী এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১৯৫২ সালের পূর্ব বাংলায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে যোগদান করেন এবং ভাষা আন্দোলনে যুক্ত থাকার অপরাধে পাকিস্তানি জেল-জুলুমের শিকার হন। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়ের পেছনে তার কার্যকর ভূমিকা ছিল। ১৯৫৬ সালে হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলে তার সাথে পররাষ্ট্রনীতি ও স্বায়ত্তশাসন নিয়ে ভাসানীর মতবিরোধ হয় এবং ১৯৫৭ সালের কাগমারী সম্মেলনে তা প্রকাশ্য রূপ নেয়। এ অবস্থায় কিছু বামপন্থি নেতার সমন্বয়ে মওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' (ন্যাপ) গঠন করেন এবং এর সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৩ সালে চীনের বিপ্লব দিবসের উৎসবে যোগ দেবার জন্য তিনি চীন যাত্রা করেন এবং কমিউনিস্ট নেতা মাও সে তুং ও চৌ এন লাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ১৯৬৭ সালে আদর্শিক দ্বন্দ্বে ন্যাপ দ্বিখন্ডিত হলে তিনি চীনাপন্থি ন্যাপের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মওলানা ভাসানী 'ভোটের আগে ভাত চাই' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় নির্বাচন বর্জন করেন।

গণঅভ্যুত্থান ও মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি উত্থাপন করলে মওলানা ভাসানী প্রথমে এর বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু ১৯৬৯ সালে যখন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ ৬ দফা ও ১১ দফাকে সামনে নিয়ে প্রবল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন তিনি 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' (৬ ডিসেম্বর) পালনের জন্য ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভার আয়োজন করেন। এতে পূর্ব পাকিস্তানের সকল আন্দোলনরত দল অংশগ্রহণ করে। সভাশেষে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন, পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির নেতৃবৃন্দ গভর্নর হাউস ঘেরাও করতে গেলে পুলিশের গুলিতে বহু হতাহত হয়। এর প্রতিবাদে মওলানা ভাসানী ঢাকা শহরে হরতাল আহ্বান করেন। তার অংশগ্রহণের ফলে সরকারবিরোধী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ৮ ডিসেম্বর প্রধান বিরোধী দল পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে হরতাল আহ্বান করে। আওয়ামী লীগ ১০ ডিসেম্বর 'নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' পালন করে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মওলানা ভাসানী ভারত গমন করেন এবং বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক চলমান হত্যাযজ্ঞের বিষয়ে বিশ্বনেতাদের অবহিত করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সহযোগিতা এবং স্বীকৃতি প্রদানের জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়কে আহ্বান জানান। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকারকে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয় এবং তিনি উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি নিযুক্ত হন।

গণঅভ্যুত্থান ও মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত রাজনীতিতে তিনি একটি স্বতন্ত্র জনরঞ্জক (Populist) রাজনৈতিক ধারার নেতৃত্ব দিয়েছেন। শোষিত ও নিপীড়িত মানুষদের স্বার্থ নিয়ে তিনি আজীবন আন্দোলন সংগ্রাম করে গেছেন। এ কারণে মওলানা ভাসানীকে 'মজলুম জননেতা' বলা হয়। তার লিখিত দুটি গ্রন্থের নাম 'দেশের সমস্যা ও সমাধান' (১৯৬২), মাও সে তুং-এর দেশে' (১৯৬৩)।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন

টপিক – ১০ আসাদুজ্জামান ও অন্যান্য

আসাদুজ্জামান ও অন্যান্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

আসাদুজ্জামান ও অন্যান্য

আসাদুজ্জামান (১৯৪২-১৯৬৯)

ছাত্রনেতা শহিদ আসাদুজ্জামান বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নাম। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে উনসত্তরের ছাত্রদের ১১-দফা গণআন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে এবং অবশেষে তা গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। তিনি ঢাকা জেলার (বর্তমান নরসিংদী) শিবপুরের ধানুয়া গ্রামে ১৯৪২ সালের ১০ জুন জন্মগ্রহণ করেন।১৯ আসাদ নামেই তিনি ব্যাপকভাবে পরিচিত। ১৯৬০ সালে শিবপুর হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক, ১৯৬৩ সালে সিলেট এমসি কলেজ থেকে আইএ, ১৯৬৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে বিএ পাস করেন। এরপর ঢাকা সিটি কলেজে এলএলবি-তে ভর্তি হন। তিনি কিছুদিন কুমিল্লার বাঞ্ছারামপুর, থানার আসমাতুন্নেসা কলেজে শিক্ষকতা করেছিলেন। তিনি ছিলেন মওলানা ভাসানীর অনুসারী। ছাত্রজীবনে তিনি ঢাকা শহর ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এবং তৎকালীন ঢাকা হলের ছাত্র ইউনিয়নের মেনন গ্রুপের সভাপতি ছিলেন।

শহিদ আসাদুজ্জামান

আসাদুজ্জামান ও অন্যান্য

আসাদুজ্জামান (১৯৪২-১৯৬৯)

পাস করার পর তিনি মওলানা ভাসানীর নির্দেশে শিবপুরে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য কৃষক সমিতি গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯৬৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর মওলানা ভাসানী সরকারি জুলুমের প্রতিবাদে পূর্ব- পাকিস্তানে হরতাল আহ্বান করলে তার নেতৃত্বে হাতিরদিয়ায় হরতাল পালিত হয়। এদিন তিনিসহ আরও দুজন পুলিশের গুলিতে আহত হন। আহত অবস্থায় সাইকেল চালিয়ে ঢাকা আসার পথে রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকেন। পরে তারই এক কৃষক কর্মীর সহযোগিতায় ঢাকা আসেন হাতিরদিয়ায় পুলিশের গুলিবর্ষণের খবর পত্রিকায় ছাপানোর জন্য

আসাদুজ্জামান ও অন্যান্য

আসাদুজ্জামান (১৯৪২-১৯৬৯)

১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন চত্বরে ছাত্রসভা আহ্বান করলে পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল সহযোগে চাঁনখারপুলের দিকে অগ্রসর হলে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ বাঁধে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের অদূরে পুলিশের গুলিতে আসাদ আহত হন। বেলা ২টার দিকে তিনি মারা যান। তার মৃত্যুতে ফুঁসে ওঠে সারা বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ। পতন ঘটে স্বৈরাচার আইয়ুব খানের। ঢাকার যেসব স্থান আইয়ুব খানের নামে পরিচিত ছিল বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা সে নামফলক নামিয়ে আসাদের নামে নতুন নামকরণ করে। এভাবে আইয়ুব গেট হয়ে যায় আসাদগেট, আইয়ুব এভিনিউ হয়ে যায় আসাদ এভিনিউ। ছাত্রনেতা আসাদ ছিলেন একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক।

আসাদুজ্জামান ও অন্যান্য

শহিদ মতিউর রহমান (১৯৫৩-১৯৬৯)

শহিদ মতিউর রহমান ছিলেন ঢাকার নবকুমার ইনস্টিটিউটের দশম শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। তার পিতা ছিলেন একজন ব্যাংকার। তিনি ১৯৫৩ সালের ২৪ জানুয়ারি ঢাকাতেই জন্মগ্রহণ করেন। কিশোর বয়স থেকেই তিনি ছিলেন রাজনীতিসচেতন। এজন্য ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি ঢাকার ছাত্রজনতা স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ঢাকার সেক্রেটারিয়েট অবরোধ করলে তিনি তাতে যোগ দেন। এদিনটি ছিল তার জন্মদিন। যে বয়সে শিশুরা কেক কাটে সে বয়সে তিনি বজ্রমুষ্টিতে নেমে এলেন রাস্তায়। তিনি ছিলেন মিছিলের অগ্রভাগে। সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ের সশস্ত্র পুলিশ আন্দোলনরত জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার অকাল মৃত্যু বৃথা যায়নি। মতিউরের আত্মত্যাগের বিনিময়ে পতন ঘটে স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের।

শহিদ মতিউর রহমান

আসাদুজ্জামান ও অন্যান্য

ড. শামসুজ্জোহা (১৯৩৪-১৯৬৯)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে প্রথম শহিদ শিক্ষক শামসুজ্জোহা পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪০-এ বাঁকুড়া জেলা স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৪৮-এ একই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করেন এবং ১৯৫০-এ বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজ থেকে আইএসসি পাস করেন। অতঃপর বাঁকুড়া ত্যাগ করে ঢাকায় এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে বিএসসি (অনার্স) এবং ১৯৫৪-তে এমএসসি (রসায়ন) পাস করেন।

ড. শামসুজ্জোহা

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ১৯৫৭-তে লন্ডনের ইমপেরিয়াল কলেজ থেকে বিএসসি অনার্স এবং ১৯৬৪-তে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬১-র মার্চ মাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেভেলপমেন্ট অফিসার হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। একই মাসে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগের লেকচারার পদ লাভ করেন। ১৯৬৬-তে রিডার পদে উন্নীত হন।

আসাদুজ্জামান ও অন্যান্য

ড. শামসুজ্জোহা (১৯৩৪-১৯৬৯)

১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনে ঢাকায় যে হত্যাকাণ্ড হয় তাতে রাজশাহীও উত্তাল হয়ে ওঠে। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেটের সামনে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলে সেনাবাহিনী বাধা দিলে তিনি ছাত্রদের সাহায্যে ছুটে যান। বিক্ষোভকারীদের ওপর আক্রমণ না চালানোর জন্য তিনি সামরিক বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানান। তার আহ্বান উপেক্ষা করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী মিছিলের ওপর গুলি চালায় এবং ড. জোহা গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যান। সে অবস্থায় জনৈক মিলিটারি অফিসার তাকে বেয়নেট দিয়ে আঘাত করলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। গুলিবিদ্ধ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে তিনি বলেছিলেন, 'যদি গুলিবর্ষণ হয় তবে কোনো ছাত্রের গায়ে লাগার পূর্বে তা আমার গায়ে লাগবে' (Your bullets will pierce my heart before hitting any student)। তার মৃত্যু আইয়ুববিরোধী গণআন্দোলনে প্রচণ্ড গতি সঞ্চার করে।

আসাদুজ্জামান ও অন্যান্য

সার্জেন্ট জহুরুল হক (১৯৩৫-১৯৬৯)

সার্জেন্ট জহুরুল হক

সার্জেন্ট জহুরুল হক ছিলেন আগরতলা মামলার ১৭তম আসামি। তাকে সেনানিবাসের কারাগারে অন্তরীণ রাখা হয়েছিল। একই কারাগারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেও বন্দি করে রাখা হয়েছিল। কথিত আছে, ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে এক পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনকে কারাগারে পাঠানো হলে সে ভুলক্রমে সার্জেন্ট জহুরুল হককে বঙ্গবন্ধু মনে করে গুলি করে। গুলি তার পেটে লাগলে তাকে মিলিটারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু সরকার প্রেসনোটে জানায় যে আসামি পালাতে চেষ্টা করলে গুলি করা হয়। সেইদিন রাত ৯:৫৫ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সার্জেন্ট জহুরুল হকের একই রকম 'গোঁফ' ছিল।

সার্জেন্ট জহুরুল হক ১৯৩৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালী জেলার সুধারাম থানার সোনাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে নোয়াখালী জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক এবং পরে জগন্নাথ কলেজ থেকে আই. কম পাস করেন।

আসাদুজ্জামান ও অন্যান্য

সার্জেন্ট জহুরুল হক (১৯৩৫-১৯৬৯)

জহুরুল হক ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে যোগ দেন এবং পর্যায়ক্রমে সার্জেন্ট পদে উন্নীত হন। ১৯৬৭ সালে সরকার দেশবিরোধী কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করে এবং আগরতলা মামলার আসামি করা হয়। তিনি কখনও কোনো বিষয়ে কারও কাছে মাথা নত করেননি। এজন্য সহকর্মীরা তাকে 'মার্শাল' বলে ডাকতেন। তিনি একজন ভালো চিত্রশিল্পীও ছিলেন। তার অঙ্কিত চিত্র ঢাকা জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত আছে।

সার্জেন্ট জহুরুল হক

আসাদুজ্জামান ও অন্যান্য

অন্যান্য শহিদেরা

১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনে আরও অনেক ব্যক্তি শহিদ হন। 'বাংলাদেশ অবজার্ভার' ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ সংখ্যার দেয়া তথ্যমতে জানা যায়, পাকিস্তান সেনাবাহিনী, ইপিআর, পুলিশ এবং দালালদের গুলিতে ৬১ জন নিহত হন। এর মধ্যে ২৯ জন ছিলেন শ্রমিক এবং ২১ জন ছিলেন ছাত্র। অন্যান্য শহিদদের মধ্যে ছিলেন কৃষক ৩ জন, চাকরিজীবী ৩ জন, শিক্ষক ২ জন, সৈনিক ১ জন এবং ১ জন ছিলেন গৃহবধূ।

১৯৬৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি আন্দোলন এত তুঙ্গে ওঠে যে এদিন পুলিশের গুলিতে মকবুল, রুস্তম আলীসহ মারা যায় ৬ জর্ন। বিক্ষুব্ধ জনতা মকবুল ও রুস্তমের লাশ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে শোক মিছিল করতে করতে ইকবাল হলে যায়। জনতা সরকারনিয়ন্ত্রিত দৈনিক পাকিস্তান' ও ইংরেজি দৈনিক 'মর্নিং নিউজ' ভবনে অগ্নিসংযোগ করে। ২৫ জানুয়ারি সরকার সেনাবাহিনী তলব করে। এদিন রাত ৮টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার জন্য ঢাকা শহরে কারফিউ জারি করা হয়। কিন্তু ছাত্র-জনতা কারফিউ ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে সেনাবাহিনীর গুলিতে মারা যায় তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র আবদুল লতিফ। এমনকি তারা নির্বিচারে গুলি ছুড়তে শুরু করলে তেজগাঁওয়ের নাখালপাড়ায় শিশুকে দুধ খাওয়ানোর সময় আনোয়ারা বেগম নামে এক মহিলা মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় সেনাবাহিনীর নির্বিচার গুলি ঠেকানোর জন্য জনতা ঢেউটিন নিয়ে রাস্তায় নেমে আসে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন

টপিক – ১১ ১৯৭০-এর নির্বাচন

১৯৭০-এর নির্বাচন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

১৯৭০-এর নির্বাচন

১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের প্রথম ও শেষ নির্বাচন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী গোলটেবিল আলোচনা ব্যর্থ হলে জনতার চাপে আইয়ুব খান তার সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন। ১৯৬৯ সালের ২৬ মার্চ এক বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া খান সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

সে মোতাবেক ২৮ মার্চ এক বেতার ভাষণে তিনি নির্বাচনের জন্য 'আইনগত কাঠামো আদেশ' ঘোষণা করেন। ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদ এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিলে নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষিত হয়। তবে ১২ নভেম্বর উপকূলীয় অঞ্চলে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সে অঞ্চলের কিছু আসনের নির্বাচন ১৭ জানুয়ারি, ১৯৭১-এ অনুষ্ঠিত হয়।

ইয়াহিয়া খান

১৯৭০-এর নির্বাচন

আইনগত কাঠামো আদেশ

ক্ষমতা গ্রহণের পরবর্তী চতুর্থ দিবসে (২৮ মার্চ) ইয়াহিয়া খান যে 'আইনগত কাঠামো আদেশ' ঘোষণা করেন, তাতে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে চারটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি 'এক ব্যক্তি এক ভোট' নীতি ঘোষণা করেন। তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি মেনে নেন। এ ছাড়া উক্ত আদেশে ১৯৬১ সালের আদমশুমারির লোকসংখ্যা অনুযায়ী প্রাদেশিক পরিষদের আসনসংখ্যা বণ্টন করা হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন বলা হয়।

১৯৭০-এর নির্বাচন

আইনগত কাঠামো আদেশ

সে অনুযায়ী–

ক. জাতীয় পরিষদে প্রদেশসমূহের আসনসংখ্যা নিম্নলিখিতরূপে বণ্টিত হবে বলা হয়–

প্রদেশের নাম	সাধারণ আসন	মহিলা আসন
পূর্ব পাকিস্তান	১৬২	৭
পাঞ্জাব	৮২	৩
সিন্ধু	২৭	১
বেলুচিস্তান	৪	১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১৮	১
কেন্দ্রশাসিত উপজাতি এলাকা	৭	x

১৯৭০-এর নির্বাচন

আইনগত কাঠামো আদেশ

খ. প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে প্রাদেশিক পরিষদ থাকবে এবং এদের আসনসংখ্যা হবে নিম্নরূপ:

প্রদেশের নাম	সাধারণ আসন	মহিলা আসন
পূর্ব পাকিস্তান	৩০০	১০
পাঞ্জাব	১৮০	৬
সিন্ধু	৬০	২
বেলুচিস্তান	২০	১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৪০	২

১৯৭০-এর নির্বাচন

আইনগত কাঠামো আদেশ

গ. আইন কাঠামো আদেশের ২০ নং ধারায় ৬টি বিষয়কে 'স্থির' বলে ঘোষণা দেয়া হয়:

১. সরকার পদ্ধতি হবে ফেডারেল পার্লামেন্টারি ধরনের;

২. যে ভাবাদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ইসলামি ভাবাদর্শভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে;

৩. প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে;

৪. নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে;

৫. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা থাকবে। বিচার বিভাগ সংবিধানের রক্ষক হবে।

৬. আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতে হবে।

১৯৭০-এর নির্বাচন

আইনগত কাঠামো আদেশ

ঘ. ১৯৭০ সালের জুনের মধ্যে নতুন ভোটার তালিকা তৈরি করতে হবে।

ঙ. সংবিধান প্রণয়নের জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ১২০ দিনের মধ্যে অধিবেশনে মিলিত হতে হবে। এ সময়ের মধ্যে সংবিধান রচিত না হলে রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন দেবেন। তবে সংবিধান রচনা ও সত্যায়ন না করা পর্যন্ত সামরিক শাসন বহাল থাকবে বলা হয়।

চ. সদস্যগণ পরিষদে বাংলা, উর্দু কিংবা ইংরেজিতে বক্তৃতা দেবেন এবং এই তিন ভাষায় সরকারি রেকর্ড রক্ষিত হবে।

ছ. আইনগত কাঠামো আদেশের ব্যাখ্যা নিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হলে প্রেসিডেন্টের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১৯৭০-এর নির্বাচন

আইনগত কাঠামো আদেশের প্রতিক্রিয়া

আইনগত কাঠামো আদেশের মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান একটি দুর্বল সংসদের রূপরেখা প্রদান করেন। ১২০ দিনের মধ্যে কোনো দলেরই সংবিধান প্রণয়ন করা সম্ভব নয়, কেননা পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়ন করতে সময় লেগেছিল ৯ বছর। তাও তা টিকে ছিল মাত্র ২ বছর। প্রকৃতপক্ষে ইয়াহিয়া খান তার পূর্ববর্তী সামরিক শাসক আইয়ুব খানের মতোই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। এজন্য আওয়ামী লীগসহ সকল প্রগতিশীল দল এই আদেশের অগণতান্ত্রিক ধারাসমূহ বাদ দেয়ার দাবি জানায়। কিন্তু ইয়াহিয়া খান তাতে কর্ণপাত করেননি। ডানপন্থি দলগুলো অবশ্য এ আদেশ মেনে নেয়। অবশেষে ভাসানীর ন্যাপ ছাড়া সকল রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।

১৯৭০-এর নির্বাচন

নির্বাচনী প্রচারণা

১৯৬৯ সালের ২ জুলাই ঘোষণা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি আবদুস সাত্তারের নেতৃত্বে একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত হয় এবং এ কমিশন নতুন ভোটার তালিকা তৈরি করে। এ তালিকা অনুযায়ী, পূর্ব পাকিস্তানের ভোটারসংখ্যা ছিল ৩,১২,১৪,৯৩৫ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ভোটারসংখ্যা ছিল ২,৫২,০৬,২৬৩ জন। ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়।

আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, এই নির্বাচন হবে ছয় দফা এবং ১১-দফার প্রতি রেফারেন্ডাম। আওয়ামী লীগ 'জয় বাংলা' শ্লোগানকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে এবং এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এ স্লোগানকে জনপ্রিয় করে তোলে। তারা নির্বাচনি প্রচারণায় পাকিস্তানের দুই অংশের বৈষম্যের সার্বিক চিত্র তুলে ধরে ব্যাপক গণজোয়ার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। ভাসানী (ন্যাপ) নির্বাচন বর্জন করে বলে 'ভোটের আগে ভাত চাই'। মুসলিম লীগের তিনটি অংশই সমাজতন্ত্র ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের তীব্র সমালোচনা করে বলে যে, ছয় দফা জয়যুক্ত হলে দেশ বিভক্ত হয়ে পড়বে। জামায়াত নেতা গোলাম আযম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফার কঠোর সমালোচনা করেন এবং ইসলামি অর্থনীতি প্রবর্তনের ওপর জোর দেন। পিডিপি কেন্দ্রকে শক্তিশালী রেখে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বলে।

১৯৭০-এর নির্বাচন

নির্বাচনের ফলাফল

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ছিল শাসকগোষ্ঠীর প্রতি জনগণের চপেটাঘাত স্বরূপ। পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামি দলগুলো পাকিস্তানি শাসকবর্গকে বুঝিয়েছিল যে, ফলাফল হবে মিশ্র ধরনের এবং কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। কিন্তু আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে তারা হতভম্ব হয়ে পড়ে। জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ৩৯.২% ভোট পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি (৭টি সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ) আসন লাভ করে।

অবশিষ্ট ২টি আসনের মধ্যে ১টি পান পিডিপি প্রধান নুরুল আমিন এবং অপরটি পান নির্দলীয় প্রার্থী পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় চৌধুরী।

অপরদিকে, জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন 'পাকিস্তান পিপল্স পার্টি' ১৮.৬% ভোটে ৮৮টি (৫টি সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ) আসনে জয়ী হয়ে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মর্যাদা পায়। এ নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ যেমন পশ্চিম পাকিস্তানে একটিও আসন পায়নি তেমনি পিপলস পার্টিও পূর্ব পাকিস্তানে কোনো আসন পায়নি। সুতরাং উভয় দলই আঞ্চলিক জনপ্রিয় দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৭০-এর নির্বাচন

নির্বাচনের ফলাফল

নিচে ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর জাতীয় ও প্রাদেশিক আসনের ফলাফল উল্লেখ করা হলো[২১]

রাজনৈতিক দলের নাম	নির্বাচনি প্রতীক	প্রাপ্ত আসন		
		জাতীয় পরিষদ	পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ	পশ্চিম পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ
আওয়ামী লীগ	নৌকা	১৬৭	২৮৮	-
পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি	তীর	৮৮	-	১৪৪
জামায়াতে ইসলাম	দাড়িপাল্লা	৪	১	৩
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	হারিকেন	৭		৮
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	বাঘ	৯		২৪
জামায়তে উলামায়ে ইসলাম	বই	৭	১	৮
মারকাজে জামায়তে উলেমা পাকিস্তান	খেজুর গাছ	৭	-	১১
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	সাইকেল	২	-	২০
ন্যাপ (ওয়ালী)	লাল টুপি	৭	১	২১
পিডিপি	-	১	২	৪
অন্যান্য দল	-	-	-	৪
স্বতন্ত্র	-	১৪	৭	৫৩
মোট		৩১৩	৩০০	৩০০

এখানে উল্লেখ্য, পাকিস্তানে নিবন্ধনকৃত ভোটারের প্রায় ৬৩% ভোটার ভোটে অংশগ্রহণ করেছিল বলে তৎকালীন সরকার দাবি করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন

টপিক – ১২ ১৯৭০-এর নির্বাচনের প্রভাব ও গুরুত্ব

১৯৭০-এর নির্বাচনের প্রভাব ও গুরুত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

১৯৭০-এর নির্বাচনের প্রভাব ও গুরুত্ব

১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার মানুষ ছয় দফার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। এ নির্বাচনে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেছিলেন যে নির্বাচিত বিজয়ী দল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ গঠন করে সংবিধান প্রণয়ন করবে। কিন্তু নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় ষড়যন্ত্র শুরু হয়। সেজন্য ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার কথা থাকলেও ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট তা স্থগিত ঘোষণা করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা রেসকোর্স ময়দানে ৩ মার্চ শপথ গ্রহণ করে এবং বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ তার বিখ্যাত ভাষণের মাধ্যমে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন। আলোচনা যে সময়ক্ষেপণ ভিন্ন কিছু নয়, তা সকলের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায়। দেশের বিভিন্ন স্থানে আসন্ন যুদ্ধের স্বতঃস্ফূর্ত প্রস্তুতিও শুরু হয়ে যায়।

১৯৭০-এর নির্বাচনের প্রভাব ও গুরুত্ব

কেননা বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে বলেছিলেন,
"আর যদি একটি গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।"
২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান গণহত্যার নির্দেশ দিয়ে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। সেই রাতে শুরু হয় ইতিহাসের সর্ববৃহৎ এবং কলঙ্কিত গণহত্যা (Operation Search Light)। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের অব্যবহিত পূর্বে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরে তার নামে আরও অনেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করে। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। সুতরাং ১৯৭০-এর নির্বাচনি ফলাফলের মধ্যেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ লুকিয়ে ছিল, একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

১৯৭০-এর নির্বাচনের প্রভাব ও গুরুত্ব

নিচে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনা করা হলো-

১. প্রথম ও শেষ সাধারণ নির্বাচন (First and Last General Election): ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম ও শেষ সাধারণ নির্বাচন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল মূলত প্রাদেশিক নির্বাচন। কিন্তু ১৯৭০ সালে একই সাথে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

২. বাঙালি জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশ (Mandate for Bengali Nationalism): ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের রায়ের মাধ্যমে তা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। কেননা সকল রাজনৈতিক দলই এটা জানত যে, এটা ছিল ছয় দফার প্রতি রেফারেন্ডাম স্বরূপ।

৩. সংগঠন ও নেতৃত্বের বিকাশ (Development of Organization and Leadership): ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে এবং পিপিপি পশ্চিম পাকিস্তানে সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৩ সাল থেকে এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৯৬৭ সাল থেকে নিজ নিজ-দলের নেতৃত্ব প্রদান করলেও প্রথম বারের মতো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেন।

১৯৭০-এর নির্বাচনের প্রভাব ও গুরুত্ব

৪.পাকিস্তানের রাজনীতিতে আঞ্চলিক মনোভাবের সৃষ্টি (Creation of Regionalism in Politics) : ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানভিত্তিক রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে একটিও আসন পায়নি। আবার পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক রাজনৈতিক দল পাকিস্তান পিপল্স পার্টি পূর্ব পাকিস্তানে কোনো আসন লাভে ব্যর্থ হয়। ফলাফলের এ প্রবণতায় অঞ্চলভিত্তিক রাজনীতির রূপ পরিলক্ষিত হয়।

৫. আওয়ামী লীগের শক্তিশালী অবস্থান (Powerful Position of Awami League): ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। নির্বাচনে জয়লাভ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'আওয়ামী লীগের এই বিরাট বিজয় প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত মানুষের বিজয়। আমরা আমাদের জনগণ, আমাদের ছাত্র, আমাদের শ্রমিক ও কৃষকদের ভালোবাসায় অভিভূত হইয়াছি। তাহারা এইবার যথাযথভাবেই ব্যক্ত করিয়াছে যে, আওয়ামী লীগ তাহাদেরই দল।'

৬. পাকিস্তানের মৃত্যুর পরোয়ানা (Death Certificate of Pakistan): এ নির্বাচনের ফলাফলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পাকিস্তানের উভয় অংশের জনগণ ভৌগোলিক ও আদর্শগতভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কেননা বঙ্গবন্ধুকে যেমন পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ গ্রহণ করেনি, তেমনি ভুট্টোকেও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সমর্থন করেনি। তাই এই নির্বাচনি ফলাফলকে অনেকেই পাকিস্তানের মৃত্যু পরোয়ানা বলে মনে করেন।

১৯৭০-এর নির্বাচনের প্রভাব ও গুরুত্ব

৭. ছয় দফার প্রতি সমর্থন (Mandate for 6-point): ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পূর্বে বঙ্গবন্ধু তার নির্বাচনি বক্তৃতায় ছয় দফার ওপর ভিত্তি করে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'আগামী নির্বাচনে জাতীয় মৌলিক সমস্যাসমূহ বিশেষ করে ৬-দফার ভিত্তিতে আমরা সমাধানের পথ গ্রহণ করেছি। তাই নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর ছয় দফার গুরুত্ব অস্বীকার করার আর কোনো পথ থাকল না।

৮. দ্বি-জাতি তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান (Rejection of Two Nations Theory): এ নির্বাচনে ধর্মভিত্তিক দলগুলোর ভরাডুবি ঘটে। বিশেষ করে মুসলিম লীগ বাংলার মাটি থেকে উচ্ছেদ হয়। যদিও এ দলগুলো এ নির্বাচনকে ধর্মরক্ষার নির্বাচন বলে প্রচারণা চালিয়েছিল তথাপি জনগণ 'ধর্মনিরপেক্ষ' আদর্শের আওয়ামী লীগকে সমর্থন দেয়ার মাধ্যমে দ্বিজাতি তত্ত্বকে অসার প্রমাণ করে দেয়।

৯. সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ (Formulation of Constitution): নির্বাচনি ইশতেহারে আওয়ামী লীগ উল্লেখ করেছিল যে ছয় দফা ও এগারো দফার ভিত্তিতে দেশের ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়ন করা হবে। তাই নির্বাচনে জয়লাভের পর তারা সংবিধান প্রণয়নকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন।

১৯৭০-এর নির্বাচনের প্রভাব ও গুরুত্ব

১০. ইয়াহিয়ার স্বপ্নভঙ্গ (Break of the Day-dream of Yahiya): ইয়াহিয়া খানের গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বাঙালিদের এতই ঘৃণা করতেন যে আওয়ামী লীগের প্রতি বাঙালিদের প্রকৃত জনমত সম্পর্কে উপযুক্ত খোঁজখবর না নিয়েই তারা মনগড়া রিপোর্ট পেশ করেন। তারা সেখানে উল্লেখ করেন যে, আওয়ামী লীগ ৪০ শতাংশের বেশি ভোট পাবে না। ডানপন্থি চাটুকার রাজনীতিকগণও ইয়াহিয়াকে একইভাবে আশ্বস্ত করেছিলেন। আর তাই ইয়াহিয়া নির্বাচনে দুর্নীতির পথে যাননি। কিন্তু নির্বাচনি ফলাফল তাদের দিবাস্বপ্ন ভেঙে দেয়।

১১. শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ (Protest Against Disparity): এ নির্বাচনি ফলাফল ছিল ১৯৪৭-১৯৭০ সময়কালে পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন

টপিক – ১৩ অসহযোগ আন্দোলন এবং এর প্রভাব

অসহযোগ আন্দোলন এবং এর প্রভাব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

অসহযোগ আন্দোলন এবং এর প্রভাব

১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ মধ্যবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে পূর্ব পাকিস্তানে যে আন্দোলন সংঘটিত হয়, তাই ইতিহাসে 'অসহযোগ আন্দোলন' নামে পরিচিত।

১৯৭০ সালের অপ্রত্যাশিত নির্বাচনি ফলাফল পাকিস্তানি সামরিক জান্তাকে ভাবনায় ফেলে দেয়। তারা বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। এদিকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের রাজনীতিবিদগণ দুই রকম অবস্থান গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, যেহেতু তিনি ৬-দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করেছেন, সেহেতু তিনি ৬-দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন।

জুলফিকার আলী ভুট্টো

অসহযোগ আন্দোলন এবং এর প্রভাব

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো এটা মেনে নিতে রাজি হয়নি। জুলফিকার আলী ভুট্টো শাসনতন্ত্র প্রণয়নের নীতিমালা সংক্রান্ত আপোসরফার জন্য ১৯৭১ সালের ২৭থেকে ২৯ জানুয়ারি ঢাকায় অবস্থান করেন। তাদের মূল দাবি ছিল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে সরে আসতে হবে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট করে বলে দেন যে, নির্বাচনের পর ছয় দফা এখন জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে, এটা পরিবর্তনের ক্ষমতা কারও নেই। ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। কিন্তু ভুট্টো তার মতামতকে প্রাধান্য না দিলে অধিবেশন বয়কটের হুমকি দেন। ভুট্টোর হুমকি আসলে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার নীল-নকশারই অংশ। তারা এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাচ্ছিল যেন বাঙালিদের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করার অজুহাত সৃষ্টি করা যায়। তিনি বলেন যে, 'তার দল শুধু একটি দল কর্তৃক ইতোমধ্যে প্রণীত একটি সংবিধানে সম্মতি দেয়ার জন্য ঢাকায় যেতে পারে না।' ২২ সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান এই রাজনৈতিক বিভক্তির সুযোগ গ্রহণ করেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ভুট্টোর পরামর্শে ১ মার্চ আসন্ন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন।

অসহযোগ আন্দোলন এবং এর প্রভাব

তিনি বলেন,
'পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান দলটি এবং আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করার ইচ্ছে নেই বলে ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে আবার হিন্দুস্থান যে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তা গোটা ব্যাপারটাকে আরো জটিল করে তুলেছে। সেজন্য আমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

অসহযোগ আন্দোলন এবং এর প্রভাব

ইয়াহিয়ার এ ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারা দেশে হরতাল আহ্বান করেন। এর ফলে সারা বাংলাদেশে সকল সরকারি কর্মকাণ্ড অচল হয়ে পড়ে। ২ মার্চ ১৯৭১ সালে প্রথমবারের মতো স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন ছাত্রনেতা আ.স.ম আবদুর রব। এদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক প্রেসবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ৭ মার্চ পর্যন্ত আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তার ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ি হয়ে ওঠে সকল কর্মসূচির উৎস। সারা দেশের মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে যে এই বাড়ি থেকে কী নির্দেশ আসে! পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ৩ মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত সারা দেশে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে হরতাল চলতে থাকে। সারা দেশ 'জয় বাংলা', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা', 'তোমার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ', 'তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর' প্রভৃতি স্লোগানে প্রকম্পিত হতে থাকে। দেশ কার্যত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চলতে থাকে, সামরিক জান্তা প্রশাসনের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। বঙ্গবন্ধু ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান। অবশেষে ইয়াহিয়া খান ৬ মার্চ এক বেতার ভাষণে ২৫ মার্চে (১৯৭১) জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন।

অসহযোগ আন্দোলন এবং এর প্রভাব

এদিন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পরিবর্তন ঘটে। ইয়াহিয়া খান 'বেলুচিস্তানের কসাই'-খ্যাত টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। বঙ্গবন্ধুর নিকট খবর আসে যে, সারা দেশে সামরিক বাহিনী অবস্থান নিতে শুরু করেছে এবং প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানপন্থি সমর্থক বিহারিদের অস্ত্র ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হচ্ছে। সিনিয়র আর্মি অফিসার এবং বড় বড় ব্যবসায়ীদের পরিবারবর্গকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। এমতাবস্থায় বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে প্রায় দশ লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতিতে তার ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণে তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এই ভাষণ পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে বিখ্যাত ৩টি ভাষণের মধ্যে অন্যতম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'The Newsweek' পত্রিকা বঙ্গবন্ধুকে এ ভাষণের জন্য Poet of Politics (রাজনীতির কবি) বলে আখ্যায়িত করে।

অসহযোগ আন্দোলন এবং এর প্রভাব

এই ভাষণের মধ্য দিয়ে তিনি তার অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন এবং পরবর্তী ৭ দিন অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য ১০ দফা নির্দেশ জারি করেন। সারা দেশে তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়। এ সময়ের মধ্যেও সামরিক জান্তা বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় ১৪ মার্চ তিনি এ যাবৎ কার্যকর সকল নির্দেশ বাতিল করে ১৫ মার্চ থেকে পালন করার জন্য ৩৫ দফা সুস্পষ্ট নির্দেশ জারি করেন। এ নির্দেশের মাধ্যমে তিনি কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেন। কেননা প্রদেশে তখন কেবল ৭টি ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া সবক্ষেত্রে তার নির্দেশই আইনের মতো পালিত হচ্ছিল, অন্য কারও নির্দেশ তখন কেউ পালন করেনি।

অসহযোগ আন্দোলন এবং এর প্রভাব

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৫টি নির্দেশ ছিল রাষ্ট্র পরিচালনার পরিপূর্ণ নির্দেশনা। প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী, বন্দর কর্তৃপক্ষ, আমদানি-রপ্তানি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস-আদালত, ব্যাংক-বিমা, পরিবহন সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছিল এতে। যেমন-

১নং নির্দেশ:

"সরকারি সংস্থাসমূহ, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েটসমূহ, সরকারি ও বেসরকারি অফিসসমূহ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ, হাইকোর্ট এবং বাংলাদেশস্থ সকল কোর্ট হরতাল পালন করবেন এবং নিচে বর্ণিত বিশেষ নির্দেশাবলি এবং বিভিন্ন সময়ে যেসব ব্যাখ্যা দেয়া হবে তা সবই মেনে চলবেন।"

৩নং নির্দেশ:

ক. ডেপুটি কমিশনারগণ ও মহকুমা অফিসারগণ তাদের কোনো দফতর না খুলে সংশ্লিষ্ট এলাকার আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন এবং উন্নয়ন কাজ ও প্রয়োজন হলে এই সকল নির্দেশ কার্যকর বা প্রয়োগ করার দায়িত্ব পালন করবেন। ডেপুটি কমিশনারগণ ও মহকুমা অফিসারগণ তাদের এসব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও নিবিড় সহযোগিতা বজায় রাখবেন।

অসহযোগ আন্দোলন এবং এর প্রভাব

খ. পুলিশ আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রয়োজনবোধে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবে।

গ. জেলের দফতরে কাজ চলবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্তরা তাদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করে যাবেন।

ঘ. আনসার বাহিনী তাদের দায়িত্ব পালন করবেন।

৪নং নির্দেশ:

বন্দর কর্তৃপক্ষ পাইলটেজসহ সকল কাজ করে যাবেন। বন্দর কর্তৃপক্ষের কেবল সেইসব অফিস খোলা থাকবে যেগুলো বন্দরে জাহাজসমূহের সহজ ও সুষ্ঠু আসা-যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। কিন্তু সৈন্য চলাচলে কিংবা সমরাস্ত্র আনানোর ও বাংলাদেশের মানুষকে নির্যাতনের জন্য সৈন্য ও সমরাস্ত্র আনা-নেয়ার কাজে কোনোভাবেই সহযোগিতা বা সাহায্য করা যাবে না। জাহাজসমূহের বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের জন্যে খাদ্যবাহী জাহাজসমূহের মাল খালাস ত্বরান্বিত করার সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর শুল্ক (পোর্ট ডিউজ) ও মাল খালাসের কর বা শুল্ক আদায় করবেন। অভ্যন্তরীণ বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর শুল্ক ও অন্যান্য শুল্ক আদায় করবেন।

অসহযোগ আন্দোলন এবং এর প্রভাব

৫নং নির্দেশ:

আমদানিকৃত সকল মাল দ্রুত খালাস করতে হবে। শুল্ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ কাজ করে যাবে এবং ধার্যকৃত শুল্ক সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের পর মাল খালাসের অনুমতি দেবে। এই কাজ সমাধানের জন্যে ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড ও ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডে বিশেষ অ্যাকাউন্ট খোলা হবে। কাস্টমস কালেক্টরগণ এই বিশেষ অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করবেন। আওয়ামী লীগ বিভিন্ন সময়ে যেসব নির্দেশ ইস্যু করবে কাস্টমস কালেক্টরগণ তদনুযায়ী অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করবেন। যে শুল্ক আদায় করা হবে তা কোনো মতেই কেন্দ্রীয় সরকারের নামে জমা হবে না।

৮নং নির্দেশ:

অভ্যন্তরীণ নদী-বন্দরগুলোর কাজ চালু রাখার জন্য ইপিএসসি, অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ও আইডব্লিউটিএর প্রয়োজনীয় কিছু সংখ্যক কর্মচারী কাজ চালিয়ে যাবেন। গণনির্যাতনের জন্য সৈন্য বা রণসম্ভার আনা-নেয়ার ব্যাপারে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা কোনো সহযোগিতা করতে পারবেন না।

অসহযোগ আন্দোলন এবং এর প্রভাব

১২নং নির্দেশ:

জেলা হাসপাতাল, টিবি ক্লিনিক, কলেরা রিসার্চ ইনস্টিটিউটসহ সকল হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন সার্ভিসগুলো যথারীতি কাজ করে যাবে। সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্স কাজ করে যাবে এবং সকল হাসপাতাল ও হেলথ সেন্টারে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করবে।

২২নং নির্দেশ:

সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থার কর্মচারী ও প্রাইমারি শিক্ষকদের বেতন; যাদের রোজ, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক কিংবা মাসিক হিসাবে দেয়া হয়ে থাকে তাদের সেভাবে দিতে হবে। যাদের বন্যা সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে এবং বাকি বেতন দেয়ার কথা, তা দিয়ে দিতে হবে। বেতন বিল তৈরির জন্য সরকারি ও আধা-সরকারি বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো খোলা রাখতে হবে।

অসহযোগ আন্দোলন এবং এর প্রভাব

২৫নং নির্দেশ:

ব্যাংকিং কার্য পরিচালনার জন্য সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে ৪টা পর্যন্ত সকল ব্যাংক খোলা থাকবে (অবশ্য মাঝে টিফিনের ছুটি থাকবে)। কিন্তু শুক্রবার ও শনিবার ব্যাংকিং কাজের জন্য সকাল ৯টা থেকে ১১.৩০ মি. পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য ১২.৩০. মি. পর্যন্ত খোলা থাকবে। অনুমোদিত লেনদেনের ক্ষেত্রে বুক ব্যালেন্সসহ অন্যান্য কার্যাবলি নিয়মিতভাবে চলবে।

৩১নং নির্দেশ:

পুনর্নির্দেশ ব্যতীত কোনো খাজনা, কর আদায় করা যাবে না। এছাড়া- (১) সকল ভূমি-রাজস্ব আদায় বন্ধ থাকবে, (২) বাংলাদেশের কোথাও কোনো লবণ কর আদায় করা যাবে না, (৩) বাংলাদেশে কোথাও কোনো তামাক কর আদায় হবে না, (৪) তাঁতিরা আবগারি শুল্ক দান ব্যতিরেকেই বাংলার সুতা কিনবেন। মিল মালিক ও ডিলাররা তাদের কাছ থেকে কোনো আবগারি শুল্ক আদায় করতে পারবেন না।

৩৫নং নির্দেশ:

সংগ্রাম পরিষদগুলো সর্বস্তরে তাদের কাজ চালু রাখবে এবং এ সকল নির্দেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে যাবে।

অসহযোগ আন্দোলন এবং এর প্রভাব

অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব ও গুরুত্ব

অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানে de facto নেতায় পরিণত হন। সারা পূর্ব পাকিস্তান তার নির্দেশে চলতে থাকে। তিনিই হয়ে ওঠেন পূর্ব পাকিস্তানের অঘোষিত সরকারপ্রধান এবং জনগণও তাকে মেনে নেয়। তার ৩২ নম্বরের বাড়ি লন্ডনের ১০নং ডাউনিং স্ট্রিট- এ রূপান্তরিত হয়। পাকিস্তান সরকারের কর্তৃত্ব কার্যত অচল হয়ে পড়ে। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারে যে, পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু তারা তা দিতে কোনো ক্রমেই রাজি ছিল না। কেননা তাহলে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণের রাস্তা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। এর ফলে ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে আসতে বাধ্য হন। ১৫ মার্চ তিনি এলেন এবং ২৪ মার্চ পর্যন্ত সমঝোতার নাটক করে আলোচনা চালিয়ে গেলেন। ২১ মার্চ ভুট্টোও ঢাকা এসে আলোচনার নাটকে অংশ নিলেন। কিন্তু এ আলোচনা কোনো সুফল বয়ে আনল না, যেহেতু তারা বাঙালিদের কাছে স্বায়ত্তশাসন ও ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজি ছিলেন না। ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান চলে গেলেন, নির্দেশ দিয়ে গেলেন গণহত্যার। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর হিংস্র আক্রমণের প্রাথমিক ধাক্কা সামলে বাঙালি দ্রুত প্রতিরোধ যুদ্ধে জড়িত হওয়ার সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করেছিল অসহযোগ আন্দোলনের সময়। কেননা অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণ বুঝতে পেরেছিল যে, লড়াই আসন্ন এবং তারা এর মধ্য দিয়ে আসন্ন লড়াইয়ের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন

টপিক – ১৪ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে যে অবিস্মরণীয় ভাষণ দিয়েছিলেন তা এককথায় অনন্য। এই ভাষণের ভাব, ভাষা, বাক্য ও শব্দচয়ন একাধারে রাজনীতিবিদ, ভাষাবিদ, কূটনীতিবিদসহ সকল বোদ্ধা শ্রেণিকে অভিভূত করেছে। এটি শুধুমাত্র বোদ্ধা শ্রেণির জন্য নয়, বরং সকল বাঙালির বোধগম্য একটি সাবলীল ভাষণ ছিল। এর মাধ্যমে জনগণ বুঝে নিল যে, নেতা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন কিন্তু শাসকবর্গ তাকে দায়ী করতে বা দোষ দিতে পারল না। রমনার রেসকোর্স ময়দানে ৭ মার্চ ১৯৭১, বিকাল ২টা ৪৫ মিনিটে শুরু করা ১৮ মিনিটের এই ভাষণটি ছিল নিম্নরূপ (টেপ রেকর্ড থেকে লিপিবদ্ধ)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ

পঞ্চম তফসিল

[১৫০ (২) অনুচ্ছেদ)

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ

ভাইয়েরা আমার,

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সাথে বলতে হয়, ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান 'মার্শাল ল' জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনে ৭ জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে দেখা করেছি।

আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো- এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ

ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম- আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করব। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলা হবে, যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেয়া হলো।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাব। ভুট্টো বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করার পর এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপনার ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কী পেলাম আমরা? আমরা পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে- তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু- আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সাথে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের উপর, আমার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ

আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি, কীসের রাউন্ড টেবিল, কার সাথে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সাথে বসবো? হঠাৎ আমার সাথে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের ওপর দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার,

২৫ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঐ শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন 'মার্শাল ল' Withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে- শুধু সেক্রেটারীয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা, কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়- তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু-

আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই ৭ দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো-- কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়- হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অ-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ

মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশনে আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নিতে পারে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তান এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সাথে দেয়ানেয়া চলবে না। কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন

টপিক – ১৫ ৭ মার্চের ভাষণের প্রভাব ও গুরুত্ব

৭ মার্চের ভাষণের প্রভাব ও গুরুত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

৭ মার্চের ভাষণের প্রভাব ও গুরুত্ব

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ৭ মার্চের ভাষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূলত এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুরো বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণভার নিজ কাঁধে তুলে নেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ বাঙালিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করলে জনগণ অধীর আগ্রহে নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা আর ঘরে ফিরে যেতে প্রস্তুত ছিল না। ততদিনে তাদের মনে স্বায়ত্তশাসন নয়, স্বাধীনতা লাভের উন্মাদনা জেগে উঠেছে। তারা স্বাধীনতার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত হয়ে তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল।

৭ মার্চের ভাষণের প্রভাব ও গুরুত্ব

৭ মার্চের ভাষণের পরপরই অনানুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ জাহাজ ও বিমানযোগে সৈন্য ও অস্ত্র আনতে থাকে। প্রতিটি ক্যান্টনমেন্টে কৌশলে বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। জনগণও স্থানে স্থানে সামরিক যান চলাচলে বাধা দেয়ার জন্য ব্যারিকেড দেয়া শুরু করে। সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার ও সৈনিকরা এ ভাষণকে আসন্ন যুদ্ধে বিদ্রোহের 'সবুজ সংকেত' বলে মনে করে প্রস্তুতি শুরু করে দেয়।

দেশের সর্বত্র সংগ্রাম পরিষদ গড়ে ওঠে। যুবকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রশিক্ষণ নেয়া শুরু করে। এই ভাষণের জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর যতবার শোনা যায় বাঙালিমাত্রই ততবার শিহরিত হয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস এই ভাষণই স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে 'বজ্রকণ্ঠ' নামে প্রচারিত হয়েছে বারবার। এই একটি ভাষণই পুরো জাতিকে দীর্ঘ নয় মাস প্রবল মানসিক শক্তি যুগিয়েছে। ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ইউনেস্কো ৭ মার্চের ভাষণকে 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' তালিকায় বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ভাষণটি ইতোমধ্যে ১৩টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন

টপিক – ১৬ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

- পাকিস্তানের রাজধানী করাচী থেকে কোথায় স্থানান্তরিত হয়? সকল বোর্ড ২০২১/

ক. ঢাকায় খ. ইসলামাবাদে গ. লাহোরে ঘ. বেলুচিস্তানে

- ছয় দফা দাবি কোথায় উত্থাপিত হয়?(সকল বোর্ড ২০১৮, ২০১৬, ২০১৫/

ক. লাহোরে খ. ঢাকায় গ. করাচিতে ঘ. ইসলামাবাদে

মৌলিক গণতন্ত্রের প্রবক্তা কে? সকল বোর্ড ২০২৩।

ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খ. ইয়াহিয়া খান

গ. আইয়ুব খান ঘ. জুলফিকার আলী ভুট্টো

কতজনকে আগরতলা মামলায় আসামি করা হয়েছিল?(সকল বোর্ড ২০১৫)

ক. ২৫ জন খ. ৩০ জন গ. ৩৫ জন ঘ. ৪০ জন

শেখ মুজিবুর রহমানকে কখন 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়? সকল বোর্ড ২০১৯/

ক. ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ খ. ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯

গ. ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ ঘ. ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

জেলের তালা ভাঙব শেখ মুজিবকে আনব-এ শ্লোগানটি-(সকল বোর্ড ২০১৮/

ক. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের খ. ১৯৬২ এর ছাত্র আন্দোলনের

গ. ১৯৬৯ এর গণ আন্দোলনের ঘ. ১৯৭১ এর মুক্তি আন্দোলনের

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের লক্ষ্য ছিল- সকল বোর্ড ২০১৭/

ক. বেসামরিক ও সামরিক আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা খ. আঞ্চলিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা

গ. গণতন্ত্রের পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ

- কোন আন্দোলনের ফলে আইয়ুব খান ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হন? সকল বোর্ড ২০২৩।

ক. এগার দফা আন্দোলন খ. ভাষা আন্দোলন

গ. গণ-অভ্যুত্থান ঘ. ছাত্র আন্দোলন

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা দাবির মূল লক্ষ্য ছিল- সকল বোর্ড ২০২৩/

ক. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন খ. শাসন ক্ষমতা গ্রহণ

গ. পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘ. জনগণের অধিকার আদায়

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন

টপিক – ১৭ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

জনাব 'ক' তার অঞ্চলের একজন জনপ্রিয় নেতা। উক্ত অঞ্চলের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য ও কতিপয় অধিকার আদায়ের জন্য তিনি শাসকগোষ্ঠীর নিকট বেশ কিছু দাবি পেশ করেন। তার দাবিসমূহ পরবর্তীতে ঐ অঞ্চলের গণমানুষের মুক্তির দাবিতে পরিণত হয়।

[দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩]

ক. মুজিবনগর সরকার কোন তারিখে শপথ গ্রহণ করে?

খ. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কী?

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে ঘটনার মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের দাবির তাৎপর্য তোমার, পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

১৯৩০ এর দশকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধে ভারতে তিনটি ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করা হয়। এগুলো হলো পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা, মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা ও কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা। [ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. ২০১৯]

ক. কে বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন?

খ. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের মামলার সাথে তোমার পঠিত কোন মামলার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত মামলার পরিণতি কি হয়েছিল? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

১৯২৯ সালে শ্রমিক আন্দোলনকে দমনের জন্য এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ৩৩ জন শ্রমিক সংগঠককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এই মামলায় অভিযুক্ত আসামিদের সমর্থনে দেশে বিদেশে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অবশেষে ১৯৩৩ সালে মামলাটি প্রত্যাহার করা হয়। [ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২]

ক. লাহোর প্রস্তাব কত সালে পেশ করা হয়?

খ. ১৯৭১ সালে বুদ্ধিজীবী হত্যা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

গ. উদ্দীপকের বর্ণনার সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন ঘটনার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. "উক্ত মামলা মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় সরকার এক করুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়"- উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো।

THANK YOU